ফাংহায় দস্যু বনহুর
রোমেনা আফাজ

দস্যু বনহুর সিরিজ

ফাংহায় দস্যু বনহুর-৬১

রোমেনা আফাজ

সালমা বুক ডিপো
৩৮/২ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

❑

নাসিমাকে বাম হাতে জাপটে ধরে ডান হাতে একটি বড় পাথর তুলে নিলো বনহুর। সে বুঝতে পেরেছে ওটা টর্চ লাইটের আলো নয়, কোনো একটা জন্তু।

জন্তুটা ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসছে ফাটলের মধ্য থেকে। চোখ দুটো অদ্ভুত ভাবে জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

বনহুর চিনতে পারলো ওটা এক ধরনের জীব, ওর নাম সিউলাকিং। অতি ভয়ঙ্কর এবং শক্তিশালী জীব ওটা, কিন্তু ওর চলৎশক্তি অতি ধীরে। সিউলাকিং বড় বড় পাহাড়-পর্বতের ফাটলে বা গুহায় বাস করে। ওদের খাদ্য হলো জীবজন্তু। এমন কি এক একটা ঘোড়াকেও ওরা অনায়াসে খেয়ে ফেলে।

বনহুর বললো—মিস নাসিমা আপনি শীঘ্র ওদিকে সরে যান, আমি ওটাকে কাহিল করার চেষ্টা করি। কঁথাগুলো বলে বনহুর বিরাট পাঁথরখন্ডটা জীবটার মাথা লক্ষ্য করে ছুড়ে মারলো।

সঙ্গে সঙ্গে জীবটা একটা বিকট শব্দ করে মাথাটা ফিরিয়ে নিলো। পুনরায় সে হেলেদুলে এগুতে লাগলো।

নাসিমা দু'হাতে মুখ ঢেকে ভীতভাবে তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো।

বনহুর তখন আবার একটি পাথর তুলে নিয়ে জীবটার মাথা লক্ষ্য করে আঘাত করলো। এবার জীবটার মাথায় ভীষণ জোরে লেগেছে, জীবটা মাথাটাকে বারবার মাটিতে ঘষতে লাগলো।

গুহাটা অন্ধকার থাকায় জীবটার দেহ স্পষ্ট দেখা না গেলেও বোঝা যাচ্ছে, জীবটা ভয়ঙ্কর এবং বিরাটদেহী। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বলেই বনহুর ওর ঠিক মাথা লক্ষ্য করে পাথর ছুড়তে সক্ষম হচ্ছে; না হলে দেখতেই পাওয়া যেতো না জীবটাকে, কারণ জীবটার দেহ গুহার অন্ধকারে মিশে গেছে যেন।

বনহুর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে একটির পর একটি পাথর তুলে আঘাতের পর আঘাত করে চললো। ভাগ্যিস গুহাটার মধ্যে অনেক ছোট-বড় পাথর ছড়িয়ে ছিলো তাই রক্ষা।

বনহুর মরিয়া হয়ে জন্তুটার সঙ্গে যুদ্ধ করে চললো। কিছুক্ষণের মধ্যেই জন্তুটা বিকট চীৎকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো। একটা সো সো শব্দ করতে লাগলো জন্তুটা।

বনহুর নাসিমাকে টেনে নিলো কাছে, সান্ত্বনা দিয়ে বললো —আর কোনো ভয় নেই মিস নাসিমা, জন্তুটা আর আমাদের আক্রমণ করতে পারবে না।

নাসিমা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, সে তো জীবনে এমন জন্তু দেখেনি বা শোনেওনি। এতোক্ষণ তার মন থেকে ভীতিভাব দূর হলো।

কিছু সময় পূর্বে তারা পেট পুরে খেয়েছিলো, তাই ক্ষুধা ছিলো না তাদের। বনহুর বললো—মিস নাসিমা, আপনি ঘুমান আমি জেগে থাকি।

নাসিমা বললো—আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত, কাজেই আপনি ঘুমান আমি আপনার পাশে বসে থাকছি।

তা হয় না মিস নাসিমা, আপনি ঘুমান।

নাসিমা বনহুরের কথা ফেলতে পারে না, ওপাশে জড়ো সড়ো হয়ে শুয়ে পড়ে।

ওদিকে বিরাট জন্তুটা পড়ে আছে, হয়তো বা মরেছে না মরেনি কে জানে।

নাসিমার চোখে ঘুম আসছে না। ভয়ভীতি আর দুশ্চিন্তা তার মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বিশেষ করে জন্তুটার জন্য তার মনে একটা আতঙ্ক রয়েছে।

বনহুর একটা পাথরে ঠেশ দিয়ে বসে রইলো। ক্রমেই রাত বাড়ছে, জন্তুটা সম্পূর্ণ নীরব হয়ে গেছে, কাজেই বনহুরও নিশ্চিন্ত।

কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে বনহুর, খেয়াল নেই।

হঠাৎ একটা কোমল স্পর্শ ললাটে অনুভব করলো বনহুর। ধীরে ধীরে চোখ মেললো সে কিন্তু কিছুই দেখতে পেলো না, জমাট অন্ধকারে চারদিক আচ্ছন্ন।

বনহুর নিশ্চুপ রইলো, বুঝতে পারলো নাসিমা তার ললাটে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। বড় ইচ্ছা হলো ওর হাতের ওপর হাত রাখে কিন্তু নিজকে সংযত করে নিলো বনহুর।

ভোরে ঘুম ভাঙতেই নাসিমা ব্যস্তকণ্ঠে বললো—এ গুহায় আমি আর এক মূহূর্ত থাকতে পারবো না। জীবটা মরে পড়ে আছে, তবু আমার ভয় পাচ্ছে।

নাসিমার কথায় বললো বনহুর এখানে থাকা আর সম্ভবও নয় মিস নাসিমা। কারণ এ জীবটা যখন পঁচতে শুরু করবে তখন ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ ছুটবে। আসুন আমরা এ গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি।

নাসিমা তাকালো উপরের দিকে, তারপর বললো—আমি কি করে অতো উপরে উঠবো?

আমি আপনাকে সাহায্য করবো মিস নাসিমা।

তবু কি সম্ভব?

নিশ্চয়ই সম্ভব। কিন্তু......

বলুন কিন্তু কি?

এখান থেকে বের হয়েও আমাদের দু'জনকে এই পর্বতেরই কোনো গুহায় লুকিয়ে থাকতে হবে, কারণ একটা কঠিন কাজের সঙ্গে আমি জড়িয়ে পড়েছি। মিস নাসিমা, আমার জন্য হয়তো আপনাকেও বেশ কিছুদিন কষ্ট করতে হবে।

আপনি আমার উদ্ধারকর্তা। আপনার জন্য আমি জীবন দিতেও কষ্ট বোধ করবো না।

তবে আমি যতদূর পারি আপনাকে......

কষ্টে রাখতে চান না, এই তো?

হা নাসিমা।

বলুন, আর একবার বলুন, নাসিমা বলে ডাকেন আমাকে।

বেশ, যদি তাই ভাল লাগে, নাসিমা বলেই ডাকবো। তবে হ্যাঁ, আপনিও আমাকে শুধু হাসান বলে ডাকবেন।

তবে আর আপনি কেন তুমি বলুন?

আচ্ছা, তুমিই বলবো। বয়সের দিক দিয়েও তুমি আমার চেয়ে অনেক ছোট, কাজেই কোনো অসুবিধা হবে না। এবার চলো কিভাবে এ গুহা থেকে বেরুনো যায়।

বনহুর নাসিমাকে তুলে ধরলো—উপরের পাথরখন্ডটা ধরে ফেলো।

নাসিমা পাথরখন্ডটা হাত বাড়িয়ে ধরলো।

বনহুর দ্বিতীয় পাথরখন্ড বেয়ে আরও কিছু উপরে উঠে গেলো। তারপর হাত বাড়ালো নাসিমার দিকে, বললো—আমার হাত ধরে ফেলো নাসিমা।

নাসিমা বনহুরের হাত ধরলো।

বনহুর ওকে টেনে তুলে নিলো আরও কিছু উপরে।

অনেক কষ্টে বনহুর নাসিমা সহ পর্বতের গুহা থেকে উঠে এলো উপরে। ক'দিন পর নাসিমা পৃথিবীর মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিঃশ্বাস নিলো।

বনহুর বললো—নাসিমা, চলো এমন একটা জায়গা আমরা খুঁজে বের করি যেখানে পৃথিবীর আলো-বাতাস পাবো অথচ আমাদের কেউ দেখতে পাবে না।

চলুন।

বনহুর চলতে শুরু করলো।

নাসিমা তাকে অনুসরণ করলো।

পর্বতের গা বেয়ে পাথরখন্ড ডিঙ্গিয়ে অতি সাবধানে এগুচ্ছে ওরা।

যেমন করে হোক একটা গোপন স্থান তাদের খুঁজে বের করতেই হবে। নাসিমাকে লুকিয়ে রেখে সে কাজ করবে। যে দৃশ্য সে কাল নিজের চোখে দেখেছে তা অতি করুণ, হৃদয় বিদারক।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুজির পর হঠাৎ একটা গুহা নজরে পড়লো বনহুরের। দুটি পর্বতের ঠিক মাঝামাঝি কতগুলো পাহাড় রয়েছে, তারই আড়ালে সুন্দর একটি গুহা।

গুহাটি বেশি বড় না হলেও বেশ পরিস্কার। মেঝেটা সমতল, সুন্দর পরিচ্ছন্ন। নাসিমা অনেক হেঁটেছে, কাজেই সে অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ করছিলো, গুহার মধ্যে বসে পড়লো সে।

গুহাটার মধ্যে বাইরের আলো প্রবেশে কোনো বাধা ছিলো না। তবে খুব আলোও নয়, ঝাপসা আলো ছিলো।

বনহুর নিজেও একটা পাথরখন্ডে ঠেশ দিয়ে বসলো।

অল্পক্ষণ বিশ্রাম করার পর বললো বনহুর—তুমি এখানে থাকো, আমি এবার চলি। দেখি আজ কিছু জোগাড় করতে পারি কিনা।

নাসিমা বললো—শিগ্‌গির ফিরবেন।

হাঁ, শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো। তুমি খুব সাবধানে থাকবে, কোনোক্রমেই যেন গুহার বাইরে যাবে না।

আপনি নিজেও সাবধানে কাজ করবেন, যেন কোনো বিপদে না পড়েন।

আমার জন্য কিচ্ছু ভেবো না নাসিমা। আচ্ছা চলি। বনহুর গুহা থেকে বের হয়ে গেলো।

নাসিমা দাঁড়িয়ে রইলো গুহার মুখে।

যতক্ষণ বনহুরকে দেখা যাচ্ছিলো ততক্ষণ নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে রইলো নাসিমা। বনহুর যখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো তখন ফিরে

গেলো সে গুহার মধ্যে। একটা ছোট্ট পাথরখন্ডে মাথা রেখে শুয়ে পড়লো নাসিমা।

ওদিকে বনহুর তখন পর্বতের গা বেয়ে পথ ধরে নীচে নেমে চলেছে। উচুঁ-নীচু আঁকাবাঁকা পথ—বনহুর ক্লান্তিহীনভাবে এগিয়ে যাচ্ছে। তার গন্তব্যস্থান হলো গত দিনের সেই পাথর কাটার স্থানটা যেখানে শ্রমিকদের উপর মালিকদের চলেছে নির্মম অত্যাচার-অবিচার।

বনহুরকে একজন শ্রমিক ছাড়া কিছু মনে হচ্ছে না। এলোমেলো চুল, ছেঁড়া জামা, প্যান্টটা হাঁটু অবধি গুটানো, পায়ে ধূলোবালি মাখানো।

বেশ কিছুক্ষণ দ্রুত চলার পর বনহুর পৌছে গেলো তার গন্তব্যস্থানে।

বনহুর মাইনে করা শ্রমিক নয়, তাই অসময়ে এসে পৌছাতেও তাকে পাহারাদারগণ গালমন্দ দেয় না বা চাবুক চালায় না। বনহুর যতক্ষণ কাজ করবে তারই মূল্য পাবে, তার বেশি সে একটি পয়সাও পাবে না।

বনহুর পৌছতেই তাকে কাজের নির্দেশ দিলো ওরা। কাজ শুরু করলো সে। একটা পাথরকাটা কুঠার নিয়ে পাথর কাটতে আরম্ভ করলো বনহুর।

কাজ করে চলেছে সে।

পয়সা তার চাই।

মাথার উপরে প্রখর সূর্যের তাপ অগ্নি বর্ষণ করছে । পায়ের নীচে পাথরগুলো যেন গরম সীসার মত গনগন করছে।

বনহুর পাথরের উপর কুঠার দিয়ে আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে। মাঝে মাঝে মাথার ঘাম আংগুল দিয়ে মুছে ফেলছে।

তাকিয়ে দেখছে বনহুর প্রতিটি শ্রমিকের অবস্থার দিকে, হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার, লোকগুলো কিভাবে পাথরের উপর লোহার শাবল চালাচ্ছে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদে ফিরে তাকায় বনহুর পিছনে। সঙ্গে সঙ্গে মুখমন্ডল তার কঠিন হয়ে উঠে। দেখতে পায় একটি বৃদ্ধ শ্রমিক পানির পাত্র হাতে পানি পান করতে যাচ্ছিলো, ঠিক ঐ সময় একটি পাষন্ড নরপশু পাহারাদার তার উপর ভীষণ আঘাত করে।

বৃদ্ধের হাত থেকে পানির পাত্রটা পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে গেছে। বৃদ্ধ মুখ থুবড়ে পড়ে আছে পাথরের উপর। কপাল কেটে রক্ত ঝরছে তবু আঘাতের পর আঘাত করে চলেছে ঐ শয়তান।

বৃদ্ধ কাতর কণ্ঠে বলছে—আমাকে মাফ করে দাও, আর আমি পানি পান করতে যাবো না।

তবু পাষাণ হৃদয় শয়তানটা থামছে না।

বনহুর অল্পক্ষণ তাকিয়ে দেখে নিলো, তারপর পিছন থেকে এসে পাহারাদারের হাতসহ চাবুকখানা ধরে ফেললো।

মুহূর্ত বিলম্ব না করে ঘুরে দাঁড়ালো পাহারাদারটি, রক্ত চক্ষু মেলে বনহুরের দিকে চেয়ে বললো—কোন্ সাহসে তুমি আমার কাজে বাধা দিতে এসেছো?

বনহুর বললো—মনের সাহসে। তুমি একে মারছো কেন?

দেখছো না কাজে ফাঁকি দিচ্ছিলো?

কি করে ও কাজে ফাঁকি দিলো?

সময় নেই অসময় নেই পানি পান করা......

পানি পান করতে দেবে না তোমরা?

দেবো কিন্তু ছুটি হলে, কাজের সময় নয়। যাও তুমি নিজের চরকায় তেল দাওগে।

বনহুর আজ ওকে ক্ষমা করে দিলো। ওর চাবুকসহ হাতখানা ছেড়ে দিয়ে ফিরে গেলো নিজের কাজে। কাজ করছে কিন্তু দৃষ্টি তার রয়েছে অন্যান্য দিকে। পাষন্ড নরপশুর দল কি করে শ্রমিকদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে, সেই দৃশ্য সে লক্ষ্য করছে।

একসময় বেলা শেষ হয়ে গেলো।

যার যার মজুরি দিলো ওরা।

বনহুরও অন্যান্যের সঙ্গে হাত পেতে মজুরি নিলো। হঠাৎ চমকে উঠলো বনহুর, যে লোকটা মজুরি দিচ্ছে, সেই পুলিশ অফিসারই তাকে সেদিন গ্রেপ্তার করতে গিয়েছিলো এবং তাকে যখন গ্রেপ্তার করে পুলিশ ভ্যানে চাপিয়ে নিয়ে আসছিলো তখন সে সঙ্গে ছিলো। বনহুরকে সে এই মুহূর্তে মোটেই চিনতে পারে না। কিছুক্ষণের দেখা মাত্র, তাছাড়া সেদিন তার দেহে ছিলো মূল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ আর আজ একটি ছেঁড়া জামা গায়ে, ধূলোবালি মাখা শরীর—চেনা সহজ কথা নয়।

লোকটা বনহুরের হাতে তার প্রাপ্য দিয়ে বললো—কাল আবার আসবে।

বনহুর জবাব দিলো—নিশ্চয়ই আসবো।

পয়সা দিয়ে কিছু ফল আর রুটি-মাংস কিনে নিলো বনহুর, আর একটি ল্যাম্পও কিনে নিলো সে।

বনহুর যখন ফিরে এলো, তখন নাসিমা আনন্দে উচ্ছ্বল হয়ে উঠে, কারণ সে এতোক্ষণ ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিলো।

বনহুর ল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিলো, একটা পাথরের আড়ালে রাখলো ল্যাম্পটাকে, যেন আলো গুহার বাইরে না যায়।

একটা গামছাও কিনে নিয়েছিলো বনহুর, তাতেই খাবারগুলো বেঁধে নিয়ে এসেছিলো। গামছা খুলে খাবারগুলো মেলে ধরে সে নাসিমার সামনে—নাও এগুলো খাও।

নাসিমা বললো—আপনিও খেয়ে নিন। সত্যি, আমি এতোক্ষণ কি যে দুশ্চিন্তায় ছিলাম আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবো না।

বনহুর ফল তুলে মুখে দিতে দিতে বললো—মেয়েরা এতো বেশি ভাবে যার কোনো মানে হয় না। বলো তো কেন এতো দুশ্চিন্তা করছিলে?

এসব দেশে প্রতি মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা রয়েছে। তাছাড়া......

বলো, থামলে কেন?

বিপদ দেখলে মানুষ সরে পড়ে আর আপনি বিপদ দেখলে সেখানে এগিয়ে যান।

এটা আমার স্বভাব নাসিমা, ছোটবেলা থেকেই বিপদকে......

বনহুরের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো নাসিমা—সাদর সম্ভাষণ জানানোই আপনার অভ্যাস, তাই না?

হাঁ।

আশ্চর্য মানুষ আপনি।

হাঁ, আশ্চর্য বটে। কই, তুমি তো কিছু খাচ্ছোনা? আমি তো কথার ফাঁকে ফাঁকে অনেক খেয়ে ফেলেছি; এবার তুমি খাও, কেমন?

না, আরও খেতে হবে আপনাকে।

তুমি আগে খাও।

উহুঁ, আপনি আরও খান।

বনহুর হেসে বললো—মেয়েদের খুব একটি খারাপ অভ্যাস আছে যা আমি পছন্দ করি না।

নাসিমার মুখ কালো হয়ে উঠলো, বললো—কি এমন খারাপ অভ্যাস আছে মেয়েদের যা আপনি পছন্দ করেন না?

ল্যাম্পের আলোতে নাসিমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেললো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর একটু হেসে বললো—নিজে না খেয়ে পুরুষকে খাওয়ানো।

এবার নাসিমার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হলো, বললো—ও এই কথা।

হাঁ, বলো সত্যি বলিনি?

হাঁ, সত্যি বলেছেন, তবে পুরুষরাও কম নয়।

মোটেই না; পুরুষরা নিজের পেট না ভরা পর্যন্ত কোনো দিকে ভাববার সময় থাকে না তাদের। দেখোনা আমি কেমন গোগ্রাসে খেয়ে ফেললাম।

কিন্তু পুরুষরাই তো যুগিয়ে আনে, তবেই তো মেয়েরা পরিবেশ করে খাওয়ায়।.

এক যুগে ছিলো পুরুষরা শুধু যুগিয়ে আনতো, মেয়েরা শুধু পরিবেশন করে সুখী হতো। আজ সে যুগ নেই, মেয়েরাও পুরুষের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে শিখেছে।

তবু আমি মানি না, কারণ পুরুষরা যা পারবে মেয়েরা তা সর্বতোভাবে পারবে না।

এ কথা মিথ্যা নাসিমা।

না, মিথ্যা নয়।

তুমি মেয়ে হয়ে মেয়েদের পক্ষ নিয়ে কথা বলছো না কেন নাসিমা?

যা সত্য আমি তাই বলবো, কারণ তার প্রমাণ আপনি।

আমি?

হাঁ, বলুন আপনি যা পারবেন আমি তা পারবো? শিক্ষায় আমি উচ্চ ডিগ্রী লাভ করেছি, বুদ্ধিতে আমি কোনো পুরুষের চেয়ে কম আছি মনে করি না, শক্তিও আছে আমার দেহে প্রচুর তবু পারলাম আমি নিজকে রক্ষা করতে......

নাসিমা!

হাঁ, মনে আছে একবার নয়, দু'বার নয়, বারবার আপনি আমাকে রক্ষা করেছেন। শুধু মৃত্যুর কবল থেকেই নয়, নারীর যে মহামূল্য সম্পদ ইজ্জত, সে ইজ্জত আপনি রক্ষা করেছেন।

বনহুর নীরবে শুনে যাচ্ছে ওর কথাগুলো।

নাসিমা বলে চলে—পারতাম...পারতাম আমি নিজকে রক্ষা করতে? কখনোই না। তবে বলুন , মেয়েরা কি করে একেবারে পুরুষদের সমান হতে পারে?

শক্তি দিক দিয়ে বিচার করলে সে আলাদা কথা। কিন্তু অন্যান্য দিক দিয়ে নারী পুরুষের চেয়ে কম নয়।

সত্যি আপনি কত মহৎ! আজ আমি কত খুশী হয়েছি, ভাষায় বুঝিয়ে বলতে পারবো না। পুরুষরা সব সময় মেয়েদের দাবিয়ে রাখতে চেষ্টা করে কিন্তু আপনি মেয়েদের কত সুনজরে দেখেন। আপনিই দেখছি অন্যান্যের ব্যতিক্রম।

থাক ও সব কথা, এবার খেয়ে নাও, দেখি।

এই তো খাচ্ছি। নাসিমা খেতে শুরু করে।

বনহুর একটা পাথরে ঠেশ দিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় সিগারেট পান করতে করতে ভাবতে থাকে তার কাজের কথা।

নাসিমা খাওয়া শেষ করে নেয়।

বনহুর হঠাৎ বলে উঠলো—কিছুদিন কষ্ট করতে হবে, পারবে তো নাসিমা? নাহলে বলো তোমাকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়ে ফিরে এসে কাজ করবো।

আমি সব কষ্ট সহ্য করতে পারবো।

তবু তুমি আমাকে একা রেখে যাবে না, এই তো?

হাঁ, আপনি আমার জন্য এতো করেছেন আর আমি পারবো না একটু কষ্ট সহ্য করতে?

কাল থেকে ফাংহায় আমার নতুন সংগ্রাম শুরু হবে। দোয়া করো নাসিমা, যেন সফলকাম হতে পারি।

উদ্দেশ্য যার মহৎ খোদা তার সহায়।

নাসিমা!

বলুন?

আজ তুমি পাশে আছো বলে আমি নিজকে অনেকটা সুস্থ মনে করছি, না হলে হয়তো ভেংগে পড়তাম। এমন নির্জন গুহায় একা একা বড় অসহ্য লাগতো।

আপনি অত্যন্ত ক্লান্ত, এবার ঘুমান।

হাঁ ঘুমাবো।

আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিই?

তোমার কষ্ট হবে না নাসিমা?

কষ্ট! সেবাই যে মেয়েদের ধর্ম।

বেশ, যদি তোমার কষ্ট না হয় দাও।

নাসিমার দু'চোখ উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠে। সেদিন চোরের মত চুপি চুপি সে ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে গিয়েছিলো, লজ্জা-সংকোচ এসে বাধা দিয়েছিলো। তবু সে গিয়েছিলো ওর পাশে। আজ প্রকাশ্যে ওর চুলে-কপালে হাত বুলাতে পারবে নাসিমা...হৃদয়ে এক অনাবিল আনন্দ উচ্ছ্বাস ঝরে পড়ে তার।

নাসিমা এসে বসে ওর পাশে, হাত রাখে ওর কপালে।

বনহুর দু'চোখ বন্ধ করে থাকে।

নাসিমা ল্যাম্পের আলোতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর মুখের দিকে। পৌরুষদীপ্ত সুন্দর মুখমন্ডলে অপরূপ এক সৌন্দর্য, সহসা দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারে না নাসিমা।

হঠাৎ চোখ মেলে বনহুর।

সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয় বনহুর আর নাসিমার। একটু হেসে পাশ ফিরে শোয় বনহুর। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়ে খেয়াল নেই।

ভোরে ঘুম ভাঙলো, চোখ মেলে তাকাতেই দেখলো, নাসিমা তার শিয়রে একটা পাথরে হেলান দিয়ে অঘোরে ঘুমাচ্ছে। ভোরের আলোতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সব।

বড় সুন্দর লাগছে নাসিমাকে।

মুগ্ধ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে বনহুর ওর মুখের দিকে। ধীরে ধীরে মাথাটা ঝুঁকে এলো ওর গোলাপী ঠোঁট দু'খানার উপর, ছোট্ট একটা চুমু দেবার জন্য ব্যাকুল হলো সে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজকে সংযত করে নিলো বনহুর। নাসিমার পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্বভার তার উপর, আর সেই কিনা.......না না, তা হয় না।

বনহুর বেরিয়ে এলো গুহা থেকে বাইরে কিন্তু মনের স্বচ্ছতা সহজে ফিরে এলো না। নিজকে তার বড় অপরাধী বলে মনে হতে লাগলো—কেন সে নিজকে সংযত করতে পারছে না। কেন সে নাসিমাকে স্পর্শ করতে যাচ্ছিলো! নাসিমার বাবার সেই কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে কানে বাজতে লাগলো....তুমি কথা দাও, আমার মা নাসিমাকে উদ্ধার করে আনবে...তার ইজ্জত রক্ষা করবে বাবা...কথা দাও...কথা দাও আমাকে...

বনহুর তার হাত ধরে কথা দিয়েছিলো...বলেছিলো নাসিমাকে উদ্ধার করবো...তার ইজ্জত রক্ষা করবো...

হঠাৎ বনহুরের চিন্তাজাল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নাসিমা এসে দাঁড়ায় পাশে। কোমল কণ্ঠে বলে—কি ভাবছেন এখানে দাঁড়িয়ে?

বনহুর কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে নাসিমার মুখে।

নাসিমা অবাক কণ্ঠে বলে—কি দেখছেন?

তোমাকে।

আমাকে?

হাঁ।

কেন বলুন তো?

বড় সুন্দর লাগছে তোমাকে!

লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠে নাসিমার মুখ। নিজকে সংযত করে নিয়ে তাকায় বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বলে—ভোরের স্নিগ্ধ আলোর মতই সুন্দর তুমি নাসিমা, তাই ভোরের আলোর মতই যেন পবিত্র থাকো তুমি।

নাসিমা!

বলুন?

এই নির্জন জনপ্রাণীহীন গুহায় শুধু আমি আর তুমি। এতো কাছে অথচ তুমি আমি কেউ কারো আপনজন নই, তবু আমরা অতি নিকটতম জন, কারণ আমরা উভয়ে উভয়ের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

হাঁ।

নাসিমা, আমি তোমাকে বোনের মতই ভালবাসি। বোনের পবিত্রতা রক্ষার দায়িত্ব ভাইয়ের কাছে। আজ থেকে তুমি আমাকে হাসান ভাই বলে ডাকবে।

বিস্ময়ভরা চোখ দুটো মেলে তাকায় নাসিমা বনহুরের দিকে, দীপ্ত সুন্দর হাস্যোজ্জ্বল মুখখানায় এতোটুকু অপবিত্রতার ছোঁয়া নেই। নাসিমা অস্ফুট কণ্ঠে বলে—আমাকে যদি বোনের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন তাহলে আমি নিজকে ধন্য মনে করবো।

নাসিমা, বোন আমার!

হাসান ভাই, সত্যি আপনি অদ্ভুত জোর্তিময় এক মহাপুরুষ। আপনার সঙ্গে এ যুগের কারো তুলনা হয় না। কথাগুলো বলে ফিরে আসে নাসিমা গুহার মধ্যে। অনাবিল এক আনন্দে মন তার ভরে উঠেছে।

প্রতিদিনের মত আজও বনহুর কাজে যোগ দেয়। কাজ করে চলেছে সে, কিন্তু লক্ষ্য তার সবদিকে। কাজ যখন শেষ হলো তখন সে গুহার পথে পা না বাড়িয়ে শ্রমিকবস্তির দিকে এগিয়ে গেলো।

ক'দিনেই শ্রমিকদের সঙ্গে বনহুর বেশ ভাব জমিয়ে নিয়েছে। সবাই বনহুরকে খাতির-যত্ন করে বসালো। চা-মুড়ি খেতে দিলো ওরা। কারণ বনহুরের ব্যবহারে তারা অত্যন্ত খুশী হয়েছে। বনহুরের আচরণে মুগ্ধ তারা।

বনহুর বললো—তোমরা পরিশ্রম করে টাকা উপার্জন করো, কারো কাছে ভিক্ষা মেগে নাওনা, অথচ তোমরা মালিকদের কাছে এমন নির্যাতন, অনাচার, অত্যাচার সহ্য করো কেন?

আমরা নিরূপায়, তাই মালিকদের এই নির্মম অত্যাচার নীরবে সহ্য করে যাই।

কেন তোমরা প্রতিবাদ করো না?

তাহলে কাজ পাবো না, না খেয়ে মরতে হবে।

তোমরা সবাই কাজ বন্ধ করে দাও।

তাহলে পয়সা পাবো কোথায়? খাবো কি?

সে ব্যবস্থা আমি তোমাদের করে দেবো।

তুমি, তুমি আমাদের ব্যবস্থা করবে!

হাঁ করবো, আজ থেকে তোমরা কেউ কাজে যাবে না।

বেশ, তাই হবে।

বনহুর শ্রমিকদের কাছ থেকে ফিরে আসে গুহায়।

নাসিমা অবাক হয়ে বলে—হাসান ভাই, আপনি এতো তাড়াতাড়ি ফিরে এলেন যে।

তোমার কাছে ভিক্ষা চাইতে।

এ আপনি কি বলছেন হাসান ভাই?

হাঁ, সত্য নাসিমা। বোন, তোমার গলার ঐ মালাছড়া আমাকে ভিক্ষা দাও।

নাসিমা হাসিভরা মুখে মালাছড়া খুলে নিয়ে বনহুরের হাতে দিয়ে বলে—ভিক্ষা নয় হাসান ভাই, এটা আপনার দাবী।

না না, দাবী নয় ভিক্ষা। নাসিমা, আজ আমি এ মালা বিক্রি করে শ্রমিকদের মুখে আহার তুলে দেবো, কারণ আজ কাউকে আমি কাজে যেতে

দেইনি। ওরা কাজ বন্ধ করে দিয়েছে, আজ খাবার নেই ওদের ঘরে। নাসিমা, কিছু মনে করো না বোনটি আমার।

নাসিমা কিছু বলার আগেই বেরিয়ে যায় বনহুর।

নাসিমা বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে ওর চলে যাওয়া পথের দিকে।

বনহুর সোজা চলে আসে ফাংহা শহরে।

একটা স্বর্ণ ব্যবসায়ীর দোকানে উঠে সে দ্রুত।

স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছেঁড়া কাপড় পরা একটি শ্রমিককে তার দোকানে প্রবেশ করতে দেখে অবাক হয়, কারণ তার দোকানে কোনো গরীব লোক বা মধ্যবিত্ত ব্যক্তির আনোগোনা ছিলো না, ধনবান বড় লোকদের আনাগোনাই বেশি।

বনহুর যখন একটি মূল্যবান মালা বের করে স্বর্ণকার মহাজনের সম্মুখে রাখলো তখন মহাজনের দু'চোখে শর্ষে ফুল ফুটলো, বললো—এ মালা তুমি কোথায় পেলে?

বনহুর তার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে বললো—দেখুন এর মূল্য কত হবে? আমার টাকা চাই।

ভ্রূকুঞ্চিত করে বনহুরের ছেঁড়া জামা, প্যান্টের দিকে তাকিয়ে মহাজন বললো—কার মালা তুমি চুরি করে এনেছো আগে তার জবাব দাও?

মালা আমার। বললো বনহুর।

মহাজন মুখ ভেংচে বললো—মালা তোমার হতেই পারে না, এ মালা তুমি চুরি করে এনেছো।

কথা শেষ হয় না মহাজনের, বনহুর বজ্রমুষ্ঠিতে চেপে ধরে তার গলার কাছে জামাটা, তারপর প্রচন্ড এক ঘুষি বসিয়ে দেয় তার নাকে।

ঝরঝর করে রক্ত ঝরে পড়ে মহাজনের নাক থেকে, চিৎ হয়ে পড়ে সে গদির উপর।

বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে সম্মুখের চাবিটা তুলে নিয়ে সিন্দুক খুলে ফেলে। থরে থরে সাজানো টাকার বান্ডিলগুলো প্যান্টের দু'পকেটে ভরে মালাটা তুলে নিয়েই দোকান থেকে বেরিয়ে পড়ে।

এতো দ্রুত সে কাজ করে যার জন্য দোকানের অন্যান্য কর্মচারী কেউ কিছু করে উঠতে পারে না। এক্ষণে সবাই কেউ রাইফেল খোঁজে, কেউ রিভলভার বের করে, কেউ পুলিশ অফিসে ফোন করে।

বনহুর দোকান থেকে বের হয়েই সম্মুখে দাঁড়ানো একটা মোটর সাইকেলে চেপে বসলো, তারপর অগণিত যানবাহনের মধ্যে মিশে গেলো।

বেশ কিছুদূর চলার পর বনহুর এক জায়গায় গাড়িখানা রেখে নেমে পড়লো। পিছনে জীপ নিয়ে ছুটে আসছে কয়েকজন পুলিশসহ সেই স্বর্ণকার মহাজন। সে নিজে পথ চিনিয়ে নিয়ে চলেছে পুলিশগণকে। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, ঐ মোটর সাইকেলখানাই তাদের লক্ষ্য।

বনহুর ওদিকে একখানা ঠেলাগাড়ী দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছুটে গিয়ে ওটাকে ঠেলে নিয়ে চললো। এ মুহূর্তে তাকে দেখলে কেউ বলবে না সে ঐ গাড়িখানার লোক নয়।

বনহুর যখন ঠেলাগাড়ীখানাকে ঠেলে নিয়ে এগিয়ে চলেছে তখন তার গাড়িখানার পাশ কেটে চলে যায় পুলিশ ভ্যানখানা। একটুখানি দেখতে পায় বনহুর, পুলিশ ভ্যানের সম্মুখের আসনে বসে চারদিকে চঞ্চল দৃষ্টি নিক্ষেপ করছে সেই মহাজন।

একটু হাসে বনহুর।

অল্পক্ষণে বিপদ কেটে যায়।

ঠেলাগাড়ীখানা একপাশে রেখে একটা বাসে উঠে পড়ে বনহুর।

ফিরে আসে বনহুর শ্রমিক কলোনীতে।

কলোনীতে পৌছে যে দৃশ্য তার নজরে পড়লো তা সে সহ্য করতে পারলো না।

বৃদ্ধ সর্দার শ্রমিকটিকে একজন রাজকর্মচারী নির্মমভাবে প্রহার করছে আর বলছে—কেন কাজে যাওনি? বলো কেন আজ কাজে যাওনি?

বৃদ্ধ বলছে—আমরা আর কাজ করবো না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার আঘাত পড়লো ওর পিঠে।

বৃদ্ধ আর্তনাদ করে উঠলো।

পুনরায় যেমনি রাজকর্মচারীটি বৃদ্ধের পিঠে আঘাত করতে যাবে, অমনি বনহুর ঝাঁপিয়ে পড়লো ওর উপর, একের পর এক ঘুষি চালাতে লাগলো।

কাহিল হয়ে পড়লো লোকটা।

দলবল তার কম ছিলো না, তারা এ দৃশ্য লক্ষ্য করে সবাই মিলে আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুর একাই সবাইকে নাজেহাল করে ফেললো। কিছুক্ষণ লড়াই করার পর সবাই পালালো প্রাণ নিয়ে।

শ্রমিক বৃদ্ধকে টেনে তুলে বুকে মাথায় হাত বুলিয়ে বললো বনহুর—আর কোনো ভয় নেই বাবা।

অন্যান্য শ্রমিক এতোক্ষণ ভয়ে কাঁপছিলো, না জানি আজ তাদের অদৃষ্টে কি আছে! মালিকের লোককে এভাবে অপদস্থ করা কম কথা নয়।

বনহুর সমস্ত শ্রমিক ডেকে জড়ো করলো এবং তাদের সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো—তোমরা আজ থেকে কেউ ওখানে কাজ করতে যাবে না। পাথরকাটা কাজ ছাড়াও তোমরা অনেক কাজ পাবে। এই নাও টাকা, তোমরা প্রত্যেকে এই টাকা দিয়ে ব্যবসা করবে।

বনহুর সবাইকে কিছু কিছু টাকা দিয়ে দেয়।

শ্রমিকগণ আনন্দে ডগমগ হয়ে উঠে।

ফিরে যায় বনহুর তার গুহায়।

যাবার সময় নাসিমার জন্য একটা শাড়ী এবং জামা কিনে নেয়। আর কিনে নেয় প্রচুর খাবার। হঠাৎ যদি দু'একদিন গুহায় ফিরতে না পারে তাহলে নাসিমার যেন কোনো কষ্ট না হয়।

বনহুর গুহায় ফিরে এলে নাসিমা তার পাশে এসে দাঁড়ায়, একগাল হেসে বলে—আজ যে বড় খুশী খুশী লাগছে হাসান ভাই আপনাকে?

এই দেখো তোমার জন্য কি এনেছি! বনহুর পুঁটলি থেকে শাড়ী-জামা বের করে বলে—তোমার শাড়ীখানা একদম ছিঁড়ে গেছে কিনা, তাই আনলাম।

আর আপনার নিজের জন্য কি এনেছেন হাসান ভাই?

আমি তো একজন শ্রমিক, আমার আবার কি লাগবে? তবে হ্যাঁ, অনেক খাবার এনেছি। বড্ড ক্ষুধা পেয়েছেন নাসিমা, খেতে দাও। এই দেখো দুটো থালা আর গেলাস এনেছি।

এ যে দেখছি সংসার পেতে নিচ্ছেন?

নাসিমার কথায় আনমনা হয়ে যায় বনহুর, একটু হেসে বলে—সংসার কি জানি না নাসিমা, তবে বড় সখ হয় সংসার করতে।

কেন সংসার করেন না আপনি?

কে কথা নাই বা শুনলে নাসিমা! নাও, খেয়ে নাও।

আপনি খান।

খাবো।

যান, ঝরণা থেকে হাত-পা বেশ করে ধুয়ে আসুন।

তুমিও যাও নাসিমা, এক কাপড়ের জন্য কতদিন স্নান করোনি; আজ স্নান করে নতুন কাপড় পরে এসো।

নাসিমা জামা-কাপড় হাতে বেরিয়ে যায়।

বনহুর ততক্ষণে খাবারগুলো থালায় গুছিয়ে রাখে।

অল্পক্ষণ পরে ফিরে আসে নাসিমা।

নতুন কাপড় পরে একরাশ এলোচুল পিঠে ছড়িয়ে ভিজে কাপড় হাতে এসে দাঁড়ায় নাসিমা।

বনহুর পদশব্দে চোখ তুলে তাকায়।

অপূর্ব সুন্দর লাগছিলো ওকে।

বনহুর মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর হেসে বলে—নাসিমা, শাড়ীখানা তোমায় সুন্দর মানিয়েছে!

নাসিমা একটু হেসে বলে, আপনি শাড়ী এনেছেন মানাবে না? বড় সুন্দর শাড়ীখানা! ওকি, এতোক্ষণও আপনি খেতে শুরু করেননি কেন?

তোমাকে ছেড়ে একা একা খাবো সে কেমন কথা! এসো আমরা দু'জনে মিলে খাই।

নাসিমা বলে—আমি ভিজে কাপড়খানা বাইরে বিছিয়ে দিয়ে আসি।

সর্বনাশ! ভিজে কাপড় বাইরে শুকাতে দিলে কেউ দেখে ফেলতে পারে, তারপর.........

না না, আমি ভিজে কাপড় বাইরে শুকাতে দেবো না, গুহার ভিতরেই মেলে দিচ্ছি।

হ্যাঁ, তাই দাও।

নাসিমা কাপড়খানা মেলে দিয়ে ফিরে এলো।

বনহুর আর নাসিমা মিলে খেতে শুরু করলো। আজ বনহুর অনেক খাবার এনেছিলো। নানারকম মিষ্টি আর ফলমূল।

খাওয়া শেষ হলে বললো বনহুর—নাসিমা।

বলুন?

এই নাও। পকেট থেকে নাসিমার মালাছড়া বের করে বাড়িয়ে ধরে বনহুর নাসিমার দিকে।

অবাক কণ্ঠে বলে নাসিমা—ওটা ফেরত এনেছেন হাসান ভাই?

দরকার পড়েনি।

টাকা আপনি কোথায় পেলেন?

সে এক অভিনব কাহিনী। এক সময় বলবো তোমাকে।

আমি এক্ষুণি শুনতে চাই...তবে কি আপনি শ্রমিকদের টাকা দেননি?

দিয়েছি। তবে শোন...বনহুর মালা সহ স্বর্ণকারের দোকানে প্রবেশ এবং শেষ অবধি সব কাহিনী সংক্ষেপে বললো।

নাসিমার দু'চোখে বিস্ময় ফুটে উঠেছে। গভীর চিন্তাযুক্ত কণ্ঠে বললো—এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটেছিলো! সত্যি হাসান ভাই, আপনি বাইরে গেলে সব সময় আমার মনে আতঙ্ক জাগে, না জানি কখন কি বিপদ ঘটিয়ে বসবেন!

বনহুর নাসিমার কথা শুনে একটু হাসলো।

পরদিন বনহুর যখন শ্রমিক কলোনীতে গিয়ে পৌঁছলো তখন যে দৃশ্য সে লক্ষ্য করলো তা অবর্ণনীয়—কলোনীতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে।

কে কোথায় ছুটোছুটি করছে।

কে মাথায় করাঘাত করে রোদন করছে।

কোথায় কে কাকে প্রহার করছে ঠিক নেই।

চারদিকে এক মহাতাণ্ডব লীলা।

ওপাশে কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে।

কতগুলো অর্ধদগ্ধ, এখনও মৃত্যু ঘটেনি।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো, সে যেন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেছে। একজন 'পানি পানি' বলে চীৎকার করছিলো, বনহুর তার পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসলো। পানি কোথায় পাবে সে এই ভীষণ অগ্নিকান্ডের মধ্যে! ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

ওদিকে তাকাতেই শিউরে উঠলো বনহুর। দেখলো একটি তরুণী জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, কেউ তাকে রুখতে পারছে না। বনহুর মুহূর্ত বিলম্ব না করে এগিয়ে গেলো, দেখতে পেলো একটা ঘর দাউ দাউ করে জ্বলছে আর সেই ঘরের মধ্যে একটা শিশু হাউমাউ করে কাঁদছে।

বনহুর নিজের গায়ের জামাটা খুলে ফেলে আগুনের মধ্যে প্রবেশ করলো। তার চারদিকে ভীষণভাবে আগুন জ্বলছে। বনহুর শিশুটিকে এক ঝটকায় তুলে নিলো কোলে, তারপর অতিদ্রুত বেরিয়ে এলো অগ্নিকুন্ড থেকে।

তরুণী দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে এলো।

বনহুর ওর কোলে তুলে দিলো শিশুটিকে।

তরুণী শিশুটিকে জীবন্ত অবস্থায় পেয়ে আনন্দে আপ্লুত হলো, চুমোয় চুমোয় ভরিয়ে দিলো শিশুর গন্ড।

বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে এ দৃশ্য দেখতে লাগলো। মনে পড়লো তার নূর আর জাভেদের কথা। সেওতো সন্তানের পিতা!

এখানে যখন বনহুর এক শ্রমিকের শিশুকে বাঁচিয়ে নিলো। তখন কান্দাই জঙ্গলে জাভেদ খেলা করছিলো। হঠাৎ একটা বিরাট সাপ তাকে আক্রমণ করে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে একটি কুকুর কোথা থেকে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাপটির উপর। শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ।

এমন সময় নূরী দূর থেকে এ দৃশ্য লক্ষ্য করে বিস্মিত হয়। জাভেদ মাকে দেখতে পেয়ে ছুটে যায়।

নূরী ওকে বুকে টেনে নিয়ে আদর করে।

ওদিকে সাপ আর কুকুরটা তখন ভীষণ লড়াই করে চলেছে।

বেশিক্ষণ কুকুরটার সঙ্গে পেরে উঠে না বিরাটদেহী অজগরটা, অল্পক্ষণে নাজেহাল হয়ে পড়ে।

জাভেদ আর নূরী তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য লক্ষ্য করছিলো, এমন সময় নাসরিন তার কন্যা ফুলকে কোলে করে এসে দাঁড়ায়।

নূরী আংগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় অদূরে একটা গর্তের পাশে অজগর সাপ আর কুকুরের যুদ্ধটা।

নাসরিন চমকে উঠে—একি কান্ড!

নূরী বলে—জাভেদকে এই মুহূর্তে সাপটা খেয়ে ফেলতো।

সর্বনাশ!

হাঁ নাসরিন, খোদা ওকে খুব জোর বাঁচিয়েছে, ভাগ্যিস কুকুরটা কোথেকে এসে পড়েছিলো, নইলে জাভেদ রক্ষা পেতো না।

ওরা তাকিয়ে দেখলো সাপটা মরে গেছে। উল্টে পড়ে আছে ওর বিরাট দেহটা।

কুকুরটা পাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে রীতিমত। সুন্দর বলিষ্ঠ কুকুরটি, নাসরিন বলে—বড় অদ্ভুত কান্ড! কুকুরটা এলো কোথা থেকে, সত্যি বড় সুন্দর!

এগিয়ে গেলো ওরা কুকুরটার পাশে কিন্তু কুকুরটা তখন বনের মধ্যে চলে গেলো।

নূরী আর নাসরিন কুকুরটাকে অনুসরণ করলো, দেখলো কুকুরটা সোজা চলে যাচ্ছে ওদিকে।

নূরী ডাকলো—আয়...আয়...

একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো কুকুরটা কিন্তু ফিরে এলো না।

নাসরিন বললো—আশ্চর্য!

সত্যি বড় আশ্চর্য, বড় অদ্ভুত ব্যাপার। নূরী জাভেদকে বললো—বাবু, বলতো সাপটা তোমাকে কিভাবে আক্রমণ করেছিলো?

জাভেদ এখন বেশ কথা বলতে শিখেছে, সে মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ে দেখালো সে কোথায় খেলা করছিলো আর কিভাবে সাপটা এসে তাকে আক্রমণ করতে যাচ্ছিলো। কুকুরটা যদি ঠিক সেই মুহূর্তে এসে না পড়তো তাহলে তাকে সাপটা খেয়ে ফেলতো।

জাভেদের কাছে সব শুনে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে নূরী আর নাসরিন কুকুরটা যে পথে চলে গেছে সেই দিকে।

সুদূর ফাংহায় বনহুর তখন শ্রমিকদের সান্ত্বনা দিয়ে চলেছে—তোমাদের বাড়িঘর ওরা জ্বালিয়ে দিয়েছে তবু তোমরা ভেংগে পড়বে না, আমি তোমাদের বাড়িঘর করার জন্য প্রচুর টাকা দেবো এবং তোমরা যাতে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকতে পারো তার ব্যবস্থা করবো।

বনহুর যখন ভগ্নহৃদয় শ্রমিকদের মধ্যে সান্ত্বনাবাণী শোনাচ্ছে তখন তাকে চারপাশ থেকে পুলিশ ঘেরাও করে ফেলেছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো তার চারপাশে অসংখ্য সশস্ত্র পুলিশ।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো বনহুর।

মুখমন্ডল গম্ভীর কঠিন হয়ে উঠে বনহুরের।

পুলিশ বাহিনী বনহুরকে ঘেরাও করে গাড়িতে তুলে নিলো।

শ্রমিকগণ অসহায় চোখে তাকিয়ে রইলো, তারা কেউ কোনো প্রতিবাদ করতে সাহসী হলো না।

বনহুরকে নিয়ে সোজা ফাংহা পুলিশ অফিসে এসে পৌঁছলো পুলিশ বাহিনী। যে পুলিশ ইন্সপেক্টার বনহুরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এলো, সে বললো—স্যার, এই সেই বিদ্রোহী শ্রমিক। এই শ্রমিকই আমাদের সব শ্রমিকের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছে। যে শ্রমিকগণ কোনোদিন সরকারের বিরুদ্ধে কোনো রকম উচ্চবাক্য প্রয়োগ করেনি, সেই শ্রমিকগণ

এখন রুখে দাঁড়াতে শিখেছে। তারা একযোগে হরতাল করতে শুরু করেছে, কেউ কাজে যোগ দিচ্ছে না। সবকিছু অনাসৃষ্টির মূলে এ।

পুলিশ সুপার দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বললো—একে মালিকের কাছে নিয়ে যাও, এর জন্য চরম শাস্তির ব্যবস্থা হবে।

বনহুরের সমস্ত শরীরে শিকল জড়ানো অবস্থায় মালিক সর্দার খাঁর কাছে নিয়ে যাওয়া হলো।

সর্দার খাঁ বনহুরকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো।

বনহুরও সর্দার খাঁর চেহারা দেখে সিংহের মত ফুলতে লাগলো। সর্দার খাঁ হলো ফাংহার অধিপতি। এই সর্দার খাঁর কথাতেই ফাংহাবাসী উঠে-বসে। ওর চেহারাটা যেন জীবন্ত শয়তানের মত।

বনহুরকে দেখে ক্রুদ্ধ বন্য শূকরের মত ঘ্যোঁৎ ঘ্যোঁৎ করে উঠলো সর্দার খাঁ। নেড়ে মাথা, বিশাল দেহ, এক জোড়া বিরাট গোঁফ। চোখ দুটো ক্ষুদ্র অথচ দু'চোখে যেন আগুন টিকরে বের হচ্ছে।

বনহুর তাকিয়ে দেখলো ওর আপাদমস্তক।

সর্দার খাঁও ওকে তীক্ষ্ণ নজরে দেখছিলো।

বনহুর অবাক হলো, শয়তান সর্দার খাঁর পাশে উপবিষ্টা এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণী। প্রথম দর্শনেই পুরুষ মনকে চঞ্চল করে। বনহুর বিস্ময়ভরা চোখে তরুণীর দিকে তাকিয়ে দেখছিলো—শয়তানের পাশে নে যহুরী। বুঝতে পারলো, সর্দার খাঁর অর্ধাঙ্গিনী। তরুণীও বনহুরকে বিস্ময় নিয়ে দেখছিলো।

হুঁশ হলো বনহুরের সর্দার খাঁর কথায়—আমার দেশের শ্রমিকদের এভাবে বিগড়ে দিয়েছো কেন?

বনহুর বললো—তারা মানুষ! পশু নয় যে তোমাদের অত্যাচার ওরা নীরবে হজম করবে।

কি বললে? আমাকে আজ পর্যন্ত কেউ তুমি বলে সম্বোধন করতে সাহসী হয়নি আর তুমি আমাকে...অপমান করলে? আরও একটি দোষ আমি প্রথমেই তোমার মধ্যে লক্ষ্য করেছি, দরবারে প্রবেশের সময় তুমি আমাকে অভিবাদন জানাওনি।

বনহুর দৃঢ়কণ্ঠে বললো—তুমি মানুষ হলে আমি তোমাকে অভিবাদন জানাতাম।

গর্জে উঠলো সর্দার খাঁ—আমি মানুষ নই?

না।

তবে আমি কি'?

পশু!

কি! কি বললে—আমি পশু'?

তুমি যদি পশু না হতে তাহলে তোমারই দেশের মানুষদের প্রতি এমন অনাচার-অত্যাচার করতে পারতে না।

একে নিয়ে যাও, এই মুহূর্তে আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যাও। চাবুকের আঘাতে আঘাতে এর দেহের চামড়া ছিঁড়ে তুলে ফেলো গে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার অর্ধাঙ্গিনী আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর কণ্ঠে বললো—না, ও অন্যায় কিছু বলেনি, সত্যিই আপনি পশুর মত।

সুরাইয়া, তুমি আমাকে অপমান করছো'?

অপমান নয়, সত্যি কথা। আমি নিজেও আপনার আচরণে ক্ষুব্ধ ছিলাম। আপনি নিরীহ শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার চালিয়েছেন তা অত্যন্ত ঘৃণ্য।

সুরাইয়া!

ওকে মুক্তি দিন।

না।

আমি হুকুম দিলাম ওকে মুক্তি দিন।

বনহুর অবাক হয়ে দেখলো শয়তান সর্দার খাঁর মুখ কালো হয়ে উঠেছে। সে ক্ষিপ্রগতিতে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারী শুরু করলো।

বনহুর তাকিয়ে দেখছে।

অন্য লোকজন এবং পুলিশ প্রহরীরা থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে।

সুরাইয়া বললো—এই মুহূর্তে ওকে মুক্তি দিন বলে দিচ্ছি।

না, কখনোই না। বললো সর্দার খাঁ।

সত্যি দেবেন না'?

না।

আমি ওকে নিজ হাতে মুক্তি দিচ্ছি।

সুরাইয়া কথাটা বলে আসন ত্যাগ করে নেমে এলো নীচে। একজন পাহারাদারের হাত থেকে একগোছা চাবি নিয়ে বনহুরের শরীর থেকে মুক্ত করে দিলো শিকলগুলো, তারপর বললো—যাও তুমি।

কটমট করে তাকালো সর্দার খাঁ বনহুর আর সুরাইয়ার দিকে।

বনহুরকে নিয়ে বেরিয়ে এলো সুরাইয়া দরবারের বাইরে। সর্দার খাঁ এবং অন্য কেউ কোনো কথা বলতে সাহসী হলো না। সবাই রাগে ফুলছে অথচ কেউ কিছু কথা বলতে পারছে না।

বনহুর সহ সুরাইয়া দরবারকক্ষের বাইরে এসে দাঁড়ালো, বললো—তুমি চলে যাও। কেউ তোমাকে পাকড়াও করতে পারবে না।

বনহুর অবাক হয়ে গেছে।

সুরাইয়াকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালো সে অন্তরে অন্তরে। মুখে সে কোনো কথা বললো না।

পথে নেমে অনেক দূর চলে এসে সে ফিরে তাকালো, দেখলো সুরাইয়া দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গায়।

বনহুর ফিরে তাকাতেই সুরাইয়া হাত নেড়ে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানালো।

গভীর রাত।

ফাংহা শহর নিদ্রার কোলে গা এলিয়ে দিয়েছে। নির্জন পথে দু'একটা গাড়ির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

সর্দার খাঁর প্রাসাদসম বাড়িখানা নীরব নিস্তব্ধ। সুরাইয়ার কক্ষে সুরাইয়া নিদ্রায় অচেতন।

হঠাৎ দরজা খুলে গেলো। সুরাইয়ার বিছানার পাশে এসে দাঁড়ালো ওর স্বামী সর্দার খাঁ। দু'চোখে তার আগুন টিকরে বের হচ্ছে। সর্দার খাঁ সুরাইয়ার নাকের উপর একটা রুমাল বুলিয়ে নিলো, তারপর হাতে তালি দিলো।

সঙ্গে সঙ্গে দু'জন জমকালো পোশাক পরা লোক এসে দাঁড়ালো তার পাশে।

সর্দার খাঁ ইংগিত করলো।

অমনি লোক দু'জন সুরাইয়ার সংজ্ঞাহীন দেহটা তুলে নিলো হাতের উপর। আলগোছে বেরিয়ে এলো ওরা বাইরে।

সিঁড়ি বেয়ে দু'জন নামতে শুরু করলো।

সর্দার খাঁ দাঁড়িয়ে রইলো সিঁড়ির মুখে।

সর্দার খাঁর বাড়ির ফটকের পাহারাদার দরজা খুলে ধরলো।

বাইরে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে একজন ড্রাইভার।

লোক দু'জন সুরাইয়ার দেহটাকে পিছন আসনে শুইয়ে দিয়ে সম্মুখ আসনে উঠে বসলো।

ড্রাইভার গাড়ি ছাড়লো।

যে লোক দু'জন সুরাইয়ার দেহটাকে বহন করে এনে গাড়িতে তুলে নিজেরাও চেপে বসলো, তারা এবার সিগারেট ধরালো। সিগারেট পান করতে করতে গল্প শুরু করলো।

প্রথম ব্যক্তি বললো—সর্দার খাঁর হুকুম রাণীজীকে নদীতে ফেলে দিতে হবে। কেউ জানতে পারবে না রাণীজী গেলো কোথায়।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো— তার চেয়ে ওকে খুন করে নদীতে ভাসিয়ে দিলে ভাল হতো। যদি বেঁচে যায় তখন?

প্রথম ব্যক্তি হেসে উঠে বললো—তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে! রাণীজী এখন অজ্ঞান, তাকে অজ্ঞান অবস্থায় পানিতে ফেললে সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।

ঠিক বলেছো ভায়া, অজ্ঞান অবস্থায় কেউ পানিতে পড়লে বাঁচতে পারে?

কিছুতেই না।

গাড়ি তখন ফাংহার হিপ্সী নদী অভিমুখে ছুটে চলেছে।

ড্রাইভারের শরীরে জমকালো পোশাক। মাথার পাগড়ীটার আঁচল দিয়ে মুখের নীচের অংশ ঢাকা। আপন মনে সে গাড়ি চালিয়ে চলেছে আর কান পেতে শুনছে ওদের কথাবার্তা।

গাড়িখানা একসময় পৌঁছে গেলো হিপ্সী নদীতীরে।

চারদিকে জমাট অন্ধকার।

একটা থমথমে ভাব বিরাজ করছে।

হিপ্সী নদীর নীল পানি যেন মিশে গেছে জমাট অন্ধকারে।

গাড়ি থামতেই লোক দুটো নেমে পড়লো।

গাড়ীর পিছন দরজা খুলে বের করে আনলো সুরাইয়ার সংজ্ঞাহীন দেহটা। ওরা দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে চললো নদীর দিকে।

ওরা চলে যেতেই ড্রাইভার অন্ধকারে গাড়ি থেকে নেমে পড়লো এবং লোক দুটিকে অনুসরণ করলো।

ড্রাইভারের দেহে জমকালো পোশাক থাকায় তাকে ওরা দেখতে পেলো না।

একেবারে নদীতীরে গিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

ওদের হাতের উপর কালকের সেই অপরূপ সুন্দরী রাণীজী সুরাইয়া।

ঝপ করে একটা শব্দ হলো।

তারপর ফিরে চললো ওরা দু'জন রিক্তহস্তে গাড়িখানার দিকে।

কিন্তু গাড়ির কাছে পৌঁছে ওরা অবাক হলো, ড্রাইভার গেলো কোথায়! অনেক খোঁজাখুজি করেও ড্রাইভারের সন্ধান পেলো না। শেষ অবধি গাড়িখানা ওরা ঠেলেই নিয়ে চললো।

ভোরের সময় ওরা গাড়ি নিয়ে যখন পৌঁছলো তখন সর্দার খাঁ খুশী হলো। এতো সহজে একটা জীবন্ত মানুষকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে ফেলা কম কথা নয়!

সর্দার খাঁ দু'জনকে বিশ হাজার টাকা পুরস্কার দিলো।

পর্বতের গুহায় নাসিমা সমস্ত রাত অনিদ্রায় কাটিয়েছে, কারণ বনহুর রাতে ফিরে আসেনি। ওর কোনো অমঙ্গল আশঙ্কায় মন তার অস্থির হয়ে উঠেছিলো।

ভোরে একটু ঘুমিয়ে পড়েছে নাসিমা, সে স্বপ্ন দেখছিলো—তার বাবা-মা-ভাইবোনদের সঙ্গে বেশ মজা করে কোথাও যাচ্ছে। হঠাৎ একটা ঝড় এসে সবকিছু তছনছ করে দিলো। কে কোথায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লো। নাসিমা এক অন্ধকারময় গর্তে পড়ে চীৎকার করছে, বাঁচাও বাঁচাও..এমন সময় দেখতে পায় এক অপূর্ব সুন্দর পুরুষ তার দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, বলে—এসো, আমার হাত ধরে উঠে এসো নাসিমা। নাসিমা ওর বলিষ্ঠ হাতখানা মুঠায় চেপে ধরে উঠে আসে উপরে। নাসিমা কৃতজ্ঞতায় তাকে ধন্যবাদ জানাতে যায়, দেখতে পায় সেই সুন্দর সুপুরুষ তারই হাসান ভাই। হাসান ভাইয়ের বুকে মাথা রাখে নাসিমা, আবেগভরা কণ্ঠে বলে—হাসান ভাই, আমি তোমায় ভালবাসি। হাসান ভাই ওকে গভীর আবেগে নিবিড়ভাবে বুকে টেনে নিয়ে বলে, আমিও তোমায় ভালবাসি নাসিমা......নাসিমার ঘুম ভেংগে যায় আচমকা। দেখতে পায় জমকালো পোশাক পরা অবস্থায় বনহুর গুহায় প্রবেশ করছে, তার কাঁধে ঝুলছে একটি সংজ্ঞাহীন নারীদেহ।

নাসিমা চমকে উঠে দাঁড়ায়, দু'চোখে তার বিস্ময় ঝরে পড়ছে।

বনহুর সুরাইয়ার সংজ্ঞাহীন দেহটা গুহার মেঝেতে শুইয়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

নাসিমার চোখেমুখে বিপুল উন্মাদনা।

বনহুর নাসিমাকে লক্ষ্য করে বললো—একে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছি নাসিমা।

নাসিমা আরও সরে এলো, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো সুরাইয়ার মুখখানা, তারপর বললো—কে এই মেয়েটি'?

সব পরে বলবো, আগে ওকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। নাসিমা, আগুন জেলে ফেলো।

নাসিমার চোখমুখ থেকে তখনও বিস্ময়ের রেখা মুছে যায়নি। সুরাইয়ার ভিজে জামাকাপড় এবং বনহুরের পোশাকও ভিজে, তবে তার জামাকাপড় কিছুটা শুকনো মনে হলো। নাসিমা কিছু শুকনো কাঠ এক জায়গায় জড়ো করে তাতে আগুন ধরিয়ে দিলো, তারপর বললো—ওর ভিজে জামাকাপড় পাল্টে দেওয়া দরকার।

হাঁ, ঠিক বলেছো কিন্তু শুকনো কাপড় কোথায় পাবে?

আপনি আমায় যে কাপড়খানা এনে দিয়েছেন, ওটা শুকনো আছে।

বেশ, তাই ওকে পরিয়ে দাও। আমি গুহার বাইরে যাচ্ছি।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

কাপড় পরিয়ে দিয়ে ভিজে কাপড়গুলো মেলে দেয় নাসিমা গুহার পাশে পাথরখন্ডগুলোর উপর। তারপর বনহুরকে বলে—হাসান ভাই, আসুন ওর কাপড় পাল্টে দেওয়া হয়েছে।

বনহুর ভিতরে আসে এবং নাসিমা ও সে নিজে সুরাইয়ার জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করে। সেই ফাঁকে বনহুর সুরাইয়া সম্বন্ধে সব কথা বলে। কেমন করে তাকে সুরাইয়া মুক্তি দিয়েছিলো, কিভাবে সুরাইয়াকে তার স্বামী হত্যা করতে চেয়েছিলো এবং কি উপায়ে সে সুরাইয়াকে নদীগর্ভ থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে, সমস্ত কথা সংক্ষেপে বলে বনহুর নাসিমার কাছে।

নাসিমা সব কথা শুনে যাচ্ছিলো। দু'চোখে তার কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠে, সুরাইয়াই তার রক্ষক হাসান ভাইকে রক্ষা করেছে। তাই নাসিমা প্রাণ দিয়ে সুরাইয়ার সেবা করে চলে।

সেদিন বনহুর আর বাইরে গেলো না।

গুহায় পূর্বদিনের যে খাবার ছিলো সেই খাবার খেয়েই তারা কাটাবে স্থির করে নিলো। কিছু ফল ছিলো, তারই রস তৈরি করে রাখলো সুরাইয়ার জ্ঞান ফিরলে তাকে খাওয়াবে।

অনেক চেষ্টার পর একসময় সুরাইয়ার জ্ঞান ফিরে এলো। চোখ মেলে তাকালো সে ধীরে ধীরে। প্রথমেই নজর পড়লো তার বনহুরের মুখে। বনহুরকে লক্ষ্য করে সুরাইয়ার চোখ দুটো উজ্জ্বল দীপ্ত হয়ে উঠলো, ঠোঁট দু'খানা নড়ে উঠলো ওর। কিছু বলতে চেষ্টা করে সুরাইয়া, বনহুর বাধা দিয়ে বলে—চুপ করে শুয়ে থাকুন, একটু সুস্থ হলে সব বুঝতে পারবেন।

চোখ বন্ধ করে সুরাইয়া।

নাসিমা ওর মুখে ফলের রস ঢেলে দেয়।

বেশিক্ষণ বিলম্ব হয় না সুরাইয়া অনেকটা সুস্থ হয়ে উঠে।

বনহুরকে লক্ষ্য করে বলে সুরাইয়া—আমি এখানে কেন? বলো আমি এখানে কি করে এলাম, কে আমাকে এখানে এনেছে?

বনহুর গম্ভীর শান্ত গলায় বললো—আমি আপনাকে এনেছি।

তুমি! তুমি আমাকে এখানে এনেছো? বেঈমান!

আপনি ভুল করছেন। বেঈমান আমি নই রাণীজী, বেঈমান আপনার স্বামী!

আমার স্বামী বেঈমান, এ কথা তোমাকে কে বললো।

তার প্রমাণ আপনি নিজে।

এসব তুমি কি বলছো!

আপনার পরিধেয় বসনের দিকে তাকিয়ে দেখুন।

সুরাইয়া নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে অবাক কণ্ঠে বললো—এ জামাকাপড় তো আমার নয়!

ঠিক বলেছেন, কারণ আপনার জামাকাপড় সব নদীর পানিতে ভিজে একাকার হয়ে গেছে। তাই ঐ মেয়েটি আপনার জামাকাপড় পাল্টে নিজের জামাকাপড় আপনার শরীরে পরিয়ে দিয়েছে।

সুরাইয়া তাকালো নাসিমার দিকে।

অবশ্য বনহুর আর সুরাইয়ার, মধ্যে খাঁটি উর্দু ভাষায় কথাবার্তা হচ্ছিলো।

ফাংহা পাকিস্তানেরই একটি অংশ, তাই ফাংহার ভাষা খাঁটি উর্দু ছিলো।

বনহুর আবার বললো—নাসিমার চেষ্টায় আপনি সংজ্ঞালাভ করেছেন।

সুরাইয়ার মুখমন্ডলে এক গভীর বিস্ময় ফুটে উঠে। সে প্রশ্নভরা ব্যাকুল দৃষ্টি তুলে ধরে বনহুরের মুখে।

বনহুর বুঝতে পারে, সুরাইয়া এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। কাজেই সে বলে—আপনার স্বামী নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে আপনাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো।

মিথ্যা কথা!

মোটেই মিথ্যা নয়।

সুরাইয়া শুয়েছিলো, এবার সে উঠে বসলো—আমার স্বামী আমাকে খুব ভালবাসে, কাজেই সে আমাকে হত্যা করার চেষ্টা কিছুতেই করতে পারে না।

বনহুর বললো—এর প্রমাণ আমি দেবো। আমি যা বলবো সেভাবে কাজ করতে হবে আপনাকে।

সুরাইয়া নিশ্চুপ রইলো।

বনহুর বলে চললো—আপনাকে আমি আপনার স্বামীর পাশে নিয়ে যাবো কিন্তু সে আপনাকে চিনতে পারবে না। ছদ্মবেশে আপনি যাবেন সেখানে এবং প্রমাণ পাবেন সব কিছুর। একটু থেমে বললো বনহুর—আপনার মহৎ হৃদয়ের জন্য আমি আপনাকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। রাণীজী, আপনি যে মুহূর্তে আমাকে মুক্তি দিয়ে আপনার স্বামীর কাছে অপরাধী হয়েছেন, আর সেজন্যই আপনার স্বামী আপনাকে হত্যা করেছে বা করতে চেয়েছিলো।

সুরাইয়ার মুখ অত্যন্ত গম্ভীর থমথমে লাগছিলো। স্থির দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে ছিলো সে বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর বললো—যে গাড়িতে আপনাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় নদীতীরে নিয়ে যাওয়া হয়, সে গাড়ির ড্রাইভারের বেশে আমি ছিলাম, কারণ আমি পূর্ব হতেই জানতাম, সর্দার খাঁ ঐ রাতে আপনাকে ঘুমন্ত অবস্থায় নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে হত্যা করবে।

শ্রমিক, তোমার কথা যদি সত্য হয় তাহলে আমি তোমাকে পুরস্কার দেবো। তুমি আমার জীবন রক্ষা করেছো, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। যা চাইবে তাই আমি দেবো তোমাকে।

বেশ, তাই হবে। নাসিমা, একে দেখো, আমি কিছুক্ষণের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

নাসিমা বললো—আচ্ছা।

বনহুর বেরিয়ে গেলো।

সুরাইয়া নাসিমাকে লক্ষ্য করে বললো—তুমি বড় সৌভাগ্যবতী নারী।

নাসিমা উর্দু ভাল বলতে না পারলেও বুঝতে তার কষ্ট হয় না। সেও ভাংগা ভাংগা উর্দুতে বললো—কি করে আপনি বুঝলেন আমি সৌভাগ্যবতী নারী?

সুরাইয়া বললো—তোমার স্বামী শ্রমিক হলেও সে সুন্দর সুপুরুষ। এটাই তোমার ভাগ্য-------

নাসিমার গন্ড রাঙা হয়ে উঠে, বলে—আমার স্বামী সে নয়।

তবে কে সে?

আমার বড় ভাই।

তোমার বড় ভাই!

হঁ্যা।

সুরাইয়ার মুখমন্ডল খুশীতে দীপ্ত হয়ে উঠে, বলে—তোমার ভাইটিকে আমার খুব ভাল লেগেছে। ওর কথাগুলো ভারী মিষ্টি লেগেছে আমার।

নাসিমার মুখে খুশীর আভাস ফুটে উঠে।

সুরাইয়া বলে—তোমরা ভাই-বোন শহর ছেড়ে এখানে থাকো কেন?

নাসিমা বলে—আমাদের কেউ নেই কিনা, তাই আমরা এখানে থাকি।

আমি যদি তোমাদের থাকার জায়গা দেই?

আমি জানি না, আমার ভাইকে বলবেন।

তোমার নাম কি?

আমার নাম নাসিমা।

ভারী মিষ্টি সুন্দর নাম তোমার। এখানে এই নির্জন পর্বতগুহায় খুব কষ্ট হয়ে তোমাদের, না?

সহ্য হয়ে গেছে।

তোমরা পাথরের উপরে ঘুমাও কি করে?

নাসিমা এবার বলে—না ঘুমিয়ে কোনো উপায় নেই, তাই ঘুমাই।

তোমার ভাইটিও বুঝি পাথরে ঘুমায়?

হঁ্যা।

সত্যি তোমাদের বড় কষ্ট হয়!

আমাদের কষ্ট উপলব্ধি করার কেউ নেই।

আমি আছি নাসিমা। এখন থেকে তুমি আমার বোন।

খুশী হলাম। এখন কি আপনি সম্পূর্ণ সুস্থবোধ করছেন?

হঁ্যা।

আপনাকে বাঁচানোর জন্য আমার ভাইয়ের কত চেষ্টা। তিনি নিজে কাঁধে করে আপনাকে এখানে বয়ে এনেছেন।

বড় আনন্দ লাগছে আমার। সত্যি, তোমার ভাইটি বড় মহৎ!

সুরাইয়া আর নাসিমার মধ্যে বেশ ভাব জমে যায়।

অনেক গল্প হয় ওদের মধ্যে।

সুরাইয়া গল্প করে তার জীবনকাহিনী...আমি ছিলাম সিন্ধুর সওদাগর ফিরোজ খাঁর একমাত্র কন্যা। সর্দার খাঁ আমার বাবার সঙ্গে ব্যবসা করতো। সে আমাকে একদিন দেখে ফেলে। আমাকে দেখে সে একেবারে উন্মাদ হয়ে উঠে। আমাকে বিয়ে করার জন্য সর্দার খাঁ বাবার কাছে প্রস্তাব দেয়।

তারপর?

বাবা বন্ধুর প্রস্তাব উপেক্ষা করতে পারেন না, তিনি বন্ধুকে কথা দেন কিন্তু আমি এ বিয়েতে রাজী হই না, কারণ আমি জানতাম সর্দার খাঁর মত নরপশু আর কেউ নেই। যেমন তার কুৎসিত চেহারা তেমনি তার কুৎসিত মন। বাবা রাজী হলেও আমি রাজী হলাম না। কিন্তু বাবা নাছোড়বান্দা, বিয়ে হলোই। সর্দার খাঁ আমাকে পেয়ে স্বর্গ হাতে পেলো, নিয়ে এলো সে আমাকে ফাংহায়। ফাংহায় এসে কি করবো, অনেক কাঁদাকাটি করলাম কিন্তু কিছু হলো না। শেষ পর্যন্ত সর্দার খাঁর কাছে নিজেকে বিসর্জন দিলাম। সর্দার খাঁ আমাকে খুব সম্মান দিলো এবং আমার কথামত সে কাজ করতে লাগলো। স্বর্ণ আভরণে আমাকে সুসজ্জিত করলো। লাখ লাখ টাকা আমার পায়ের নীচে রেখে দিলো সে। আমি ধীরে ধীরে তার বাধ্য হয়ে পড়লাম, অবশ্য সেও আমার বাধ্য হয়ে পড়লো অনুগত দাসের মত। ক্রমে আমি ওকে নিজের অজ্ঞাতে ভালবেসে ফেললাম। জানতাম স্বামীই মেয়েদের সবকিছু, বিশেষ করে আমাদের ইসলাম ধর্মে। কিন্তু আমি জানতাম না আমার স্বামী আমাকে কোনোদিন এভাবে হত্যা করতে পারে। এ কথা আমি ভাবিনি কোনো সময়। থামলো সুরাইয়া।

নাসিমা বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে অবাক হয়ে শুনছিলো ওর কথাগুলো।

সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে আসে বনহুর।

হাতে তার একটি প্যাকেট আর কিছু খাবার ও ফলমূল।

বনহুর খাবারগুলো নাসিমার হাতে দিয়ে বললো—তোমরা খেয়ে নাও।

নাসিমা খাবার ও ফলমূলগুলো নিয়ে সুরাইয়া ও বনহুরকে খেতে দিলো। নিজেও খেতে শুরু করলো।

বনহুর ফল খেতে ভালবাসে, তাই সে ফল নিয়ে বসলো।

বনহুর যখন আপন মনে ফল খাচ্ছিলো তখন নিস্পলক নয়নে তাকিয়ে দেখছিলো সুরাইয়া ওকে।

নাসিমা মৃদু হেসে বলে—বোন, খাচ্ছেন না কেন? খেয়ে নিন।

হুঁশ হলো সুরাইয়ার, লজ্জিতভাবে বললো—খাচ্ছি বোন।

সুরাইয়া খেতে শুরু করলো।

একসময় তাদের খাওয়া শেষ হলো।

বনহুর বললো—রাণীজী, এবার আপনাকে পুরুষ সাজতে হবে।

সুরাইয়া কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো।

বনহুর প্যাকেট খুলে বের করলো পুরুষের ড্রেস। তাতে এমন কি গোঁফ-দাড়িও রয়েছে।

বনহুর নিজের হাতে সুরাইয়াকে পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত করে নিলো। গোঁফ-দাড়ি লাগিয়ে ওকে একেবারে পুরুষ সাজিয়ে ফেললো।

অবশ্য সুরাইয়া প্রথমে আপত্তি জানিয়েছিলো। পরে বনহুর যখন বুঝিয়ে বললো, এ ছাড়া আপনার স্বামীর গোপন রহস্য উদঘাটন করা আপনার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হবে না, তখন আর সে আপত্তি করলো না।

সুরাইয়াকে একটি নবীন যুবক বলে মনে হচ্ছিলো।

বনহুর নিজেও দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে নিলো।

একটি আয়নাও এনেছিলো বনহুর, সুরাইয়াকে দিয়ে বললো—দেখুন আপনি নিজকে চিনতে পারেন কিনা?

সুরাইয়া নিজের চোহারার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলো, নিজকে সে নিজেই চিনতে পারলো না।

বনহুর নিজেও এক সাধু বাবাজীর পোশাকে সজ্জিত হয়ে নিলো। তারপর তারা নাসিমার কাছে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

সোজা তারা উপস্থিত হলো সর্দার খাঁর দরবারে।

ফটকে বাধা পেলো সাধু বাবাজী আর তার শিষ্য যুবকটি।

সাধু বাবাজী যখন বললো—আমি সর্দার খাঁর মঙ্গল কামনা করে এসেছি, তার সম্মুখে আমাকে নিয়ে চলো, তখন পাহারাদার সাধু বাবাজী ও তার যুবক শিষ্যটিকে সঙ্গে করে সর্দার খাঁর নিকটে নিয়ে হাজির হলো।

সর্দার খাঁ তখন তার বিশ্রামকক্ষে বিশ্রাম করছিলো। পাহারাদারের মুখে যখন সে শুনতে পেলো এক সাধু বাবাজী ও এক শিষ্য তার মঙ্গলার্থে তার

বাসভবনে হাজির হয়েছেন তখন সে নিজের বিশ্রামকক্ষেই তাদের ডেকে পাঠালো।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য সর্দার খাঁর কক্ষে প্রবেশ করে প্রথমে হকচকিয়ে যায়। একটি অর্ধ উলঙ্গ তরুণী বসে আছে তার পাশে। সর্দার খাঁর কাঁধে তার মাথাটা রেখে বিশ্রাম করছে সে।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য কক্ষমধ্যে প্রবেশ করতেই সর্দার খাঁ তরুণীটিকে সরিয়ে দিয়ে সোজা হয়ে বসলো।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্যটিকে পাশের আসনে বসার জন্য নির্দেশ দিলো।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য আসন গ্রহণ করলো।

সাধু বাবাজী মাঝে মাঝে তাকিয়ে দেখলো তার-শিষ্যের মুখখানা।

এবার বললো সর্দার খাঁ—সাধু বাবাজী বলুন, কেন আপনার আগমন?

সাধু বাবাজী মাটিতে চক দিয়ে কয়েকটা রেখা টেনে বললো—আপনি যে কাজ গোপনে সমাধা করেছেন তা অচিরে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা আছে এবং আপনারও বিপদ সন্নিকটে বলে মনে হচ্ছে।

মুহূর্তে সর্দার খাঁর মুখ কালো হয়ে উঠলো। নেড়ে মাথার উপরে বারকয়েক হাত বুলিয়ে নিয়ে বললো—সাধু বাবাজী, আপনি এ সব কি বলছেন?

হুঁ বড় ভয়ঙ্কর কথা, বড় ভয়ঙ্কর কথা। আপনার প্রিয়তমা পত্নী...

সর্দার খাঁ প্রায় চীৎকার করে উঠলো—চুপ করুন সাধু বাবাজী, চুপ করুন—ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠলো তার মুখমন্ডল। এদিক সেদিক তাকিয়ে পাশের তরুণীকে লক্ষ্য করে বললো—প্রিয়া, তুমি অল্পক্ষণের জন্য একটু বাইরে যাও, একটু বাইরে যাও তুমি।

তরুণী বিরক্তভাবে উঠে দাঁড়ালো, তারপর সাধু বাবাজী ও তার শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বেরিয়ে গেলো কক্ষ থেকে।

এবার সর্দার খাঁ প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে সাধু বাবাজীর পায়ের কাছে বসে পড়লো। দু'হাতে সাধু বাবাজীর পা জড়িয়ে ধরে বললো—আপনি এসব কথা কি করে জানলেন? কি করে জানলেন সাধু বাবাজী বলুন?

সবকিছু আমি যোগবলে জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি আপনি আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করে হত্যা করেছেন।

সাধু বাবাজী, এ কথা যেন বাইরের কেউ জানতে না পারে। বলুন বাবাজী, আপনি কি চান? যা চাইবেন তাই দেবো।

সাধু বাবাজী আবার মাটিতে আঁচড় কেটে বললো—আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে হত্যা করে আপনি নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছেন কিন্তু তা হবার উপায় নেই। আপনার স্ত্রীর প্রেতাত্মা সর্বক্ষণ আপনাকে অনুসরণ করে ফিরছে। ছায়ার মত সে আপনার পিছনে লেগে আছে, কাজেই বুঝতে পারছেন....

মড়ার মুখের মত ফ্যাকাশে মুখে বলে উঠে সর্দার খাঁ—এ কথা সত্য?

হাঁ, সত্য।

সাধু বাবাজী, বলুন কি করে আমি আমার পত্নীর প্রেতাত্মার হাত থেকে রেহাই পাবো?

সে অতি ভয়ঙ্কর ব্যাপার!

বলুন সাধু বাবাজী, উপায় বলুন?

আজ বলা সম্ভব নয়, কাল আবার আসবো এবং সব বলবো।

সেদিনের মত সাধু বাবাজী উঠে পড়লো।

শিষ্যও সাধু বাবাজীকে অনুসরণ করলো।

সর্দার খাঁ একগাদা টাকা হাতে গুঁজে দিলো সাধু বাবাজীর —এই টাকাগুলো আপনার সেলামি, কাল আবার দেবো কিন্তু এ কথা যেন বাইরে কেউ জানতে না পারে।

সাধু বাবাজী চলে যায়।

টাকাগুলো সে শিষ্যের হাতে দেয়।

একসময় তারা ফিরে আসে তাদের গুহায়।

নাসিমা উদ্বিগ্নতা নিয়ে প্রতীক্ষা করছিলো। বনহুর আর সুরাইয়া ফিরে আসায় খুশী হলো সে।

সুরাইয়া তার ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে ফিরে এলো।

নাসিমা তখন বনহুর আর সুরাইয়াকে খেতে দিলো। সুরাইয়া কিন্তু খেতে বসে মুখ গম্ভীর করে রইলো। তার ললাটে ফুটে উঠেছে গভীর চিন্তারেখা।

বনহুর বললো—এবার আপনার ভুল ভেঙ্গে গেছে তো রাণীজী?

সুরাইয়া বললো—হাঁ, আমার ভুল ভেঙ্গে গেছে। আমি ভাবতে পারিনি আমার স্বামী আমাকে কোনোক্রমে হত্যা করতে পারে। তারপর দাঁতে দাঁত পিষে বললো সে—সর্দার খাঁর আসল রূপ ধরা পড়ে গেছে আমার কাছে। সে

সে এমন চরিত্রহীন জঘন্য আমি তা জানতাম না। ঘৃণায় ওর মুখমন্ডল কঠিন হয়ে উঠলো।

বনহুর বললো—এখানেই শেষ নয় রাণীজী। আপনার স্বামীর পাশে থেকে আপনাকে সব লক্ষ্য করতে হবে। শত শত জনগণের বুকের রক্ত শোষণ করে সে প্রচুর সম্পদ করেছে। আর আমি তাকে শোষণ করতে দেবো না। একটু থেমে আবার বললো বনহুর—সেদিন আপনি আমাকে মুক্তি দিয়ে আমাকে আপনার কাছে ঋণী করেছেন।

সুরাইয়া বললো—তোমাকে মুক্তি দিয়ে আমি নিজে গর্বিত, আনন্দিত হয়েছি। তুমি শ্রমিক, অথচ তোমার মধ্যে আমি যে প্রতিভাদীপ্ত প্রাণ দেখেছি তা সত্যিই বিস্ময়কর। একটা কথা আজও আমি জানি না, শ্রমিক, তোমার নাম কি? আমি তোমাকে কি বলে ডাকবো?

বনহুর একটু হেসে বললো—আমাকে আমার বোন নাসিমা হাসান ভাই বলে ডাকে। রাণীজী, আপনি আমাকে হাসান বলে ডাকবেন।

সুরাইয়া বনহুরের নামটা অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করলো—হাসান!

সুরাইয়া নামটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যেন মনে হলো তার অন্তরে গেঁথে নিলো ঐ নামটাকে। একটু ভেবে বললো আবার সুরাইয়া—দেশের জনগণকে আমিও প্রাণ দিয়ে ভালবাসি। জনগণের প্রতি অন্যায়-অনাচার-জুলুম আমিও সহ্য করতে পারি না। হাসান, আমার স্বামীকেও আমি এ ব্যাপারে ক্ষমা করবো না। আমি তোমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবো।

রাণীজী, আপনার সহায়তায় আমি ফাংহায় পূর্ণ শান্তি স্থাপনে সমর্থ হবো। প্রথমে আপনি আমার সঙ্গে চলুন, নিজের চোখে দেখুন সর্দার খাঁ কি করে ফাংহাবাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে।

বনহুরের কথায় সুরাইয়া খুশী মনে সায় দিলো। সে নিজে যাবে বলে কথা দিলো তাকে।

পরদিন বনহুর আর সুরাইয়া শ্রমিক কলোনীতে গিয়ে হাজির হলো। সুরাইয়া নিজের চোখে যে দৃশ্য দেখলো তা সত্যি হৃদয় বিদারক।

কলোনীর শ্রমিকগণ একেবারে নাজেহাল অবস্থায় রয়েছে। ঘরবাড়ি তাদের যা-ও সামান্য ছিলো তা-ও জ্বালিয়ে দিয়েছে, পোড়া ভিটার উপরে কোনো রকমে রাত কাটায় ওরা! ছিন্নভিন্ন বসন, হাঁড়ি-পাতিল এবং অন্য সরঞ্জাম বলতে কিছু নেই। সব আগুনে পুড়ে গেছে।

শ্রমিকদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি প্রায় উলঙ্গ, অর্দ্ধ উলঙ্গ অবস্থায় রয়েছে। বনহুর আর সুরাইয়া সম্পূর্ণ ছদ্মবেশে গিয়েছিলো, কাজেই তাদের কেউ চিনতে পারলো না।

বনহুর আর সুরাইয়া যখন শ্রমিক কলোনীতে শ্রমিকদের বেশে গিয়েছিলো তখন সর্দার খাঁর লোক এসেছে তাদের পাকড়াও করে নিয়ে যেতে, কারণ তাদের দ্বারা পাথর কাটার কাজ করানো হবে। ওরা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো, তার জন্য ওদের বাড়িঘর সব জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, অনেককে হত্যা করা হয়েছে। অনেক তরুণীকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তবু ওরা ক্ষান্ত হয়নি। আজও এসেছে এদের উপর অকথ্য ব্যবহার করতে।

হঠাৎ একটা আর্তনাদে ফিরে তাকাতেই দেখতে পায় বনহুর আর সুরাইয়া, কতগুলো শ্রমিককে সর্দার খাঁর লোক ধরে বেদম প্রহার করছে।

একটা লোকের নাকেমুখে রক্ত বেরিয়ে পড়েছে। লোকটার জীবন যায় আর কি!

সুরাইয়া এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না, দু'হাতে সে চোখ ঢেকে ফেললো।

বনহুর চাপা কণ্ঠে বললো—দেখুন রাণীজী, সব দেখুন। আপনার স্বামীর অনুচরগণের আচরণ দেখুন। এর প্রতিকার আপনাকেই করতে হবে। কিন্তু এই মুহূর্তে আমি এদের শায়েস্তা করবো...

ঠিক ঐ সময় একটি বৃদ্ধ শ্রমিককে হাত-পা বেঁধে চাবুক দিয়ে আঘাত করে চলেছে। বৃদ্ধ মরিয়া হয়ে কাঁদাকাটি করছে।

বনহুর এগিয়ে গেলো এবং দৃঢ় হাতে ধরে ফেললো প্রহরীর চাবুক সহ হাতখানা। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—শয়তানির জায়গা পাওনি, না?

প্রহরী বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে তাকালো এবং সঙ্গে সঙ্গে চাবুক সহ হাতখানাকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু বনহুরের বলিষ্ঠ হাতের মুঠি থেকে হাতখানা সহজে ছাড়িয়ে নিতে পারলো না।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে সুরাইয়া।

ততক্ষণে আরও কয়েকজন লোক বনহুরকে ঘিরে ফেললো।

বনহুর ক্ষিপ্রগতিতে চাবুকটা টেনে নিয়ে এক একজনকে ভীষণভাবে আঘাতের পর আঘাত করে চললো।

কাউকে বা প্রচন্ড ঘুষি লাগালো।

বনহুরের কাছে অল্পক্ষণেই পরাজয় বরণ করলো ওরা, কে কোন্ দিকে পালালো ঠিক নেই।

সুরাইয়া হতবাক হয়ে গেছে যেন। সে বহু পুরুষ দেখেছে কিন্তু এমন বীর, শক্তিশালী পুরুষ সে দেখেনি।

বনহুর এগিয়ে এলো হাতের পিঠে কপালের ঘাম মুছতে মুছতে।

সুরাইয়া লজ্জানত চোখ দুটো তুলে ধরলো বনহুরের মুখে, কোনো কথা সে সহসা বলতে না পারলেও অন্তরে অন্তরে ধন্যবাদ জানালো তাকে।

বনহুরের কপালের এক জায়গায় একটু কেটে গিয়েছিলো।

সুরাইয়া নিজের আঁচলে বনহুরের কপাল থেকে রক্তবিন্দু মুছিয়ে দিলো সযত্নে।

বনহুর ওকে বারণ করলো না।

ওদিকে শয়তান প্রহরীদল সর্দার খাঁর কাছে গিয়ে নালিশ জানালো! শ্রমিকদের একজন তাদেরকে ভীষণভাবে অপমান করেছে—শুধু অপমান নয়, তাদের খুব করে পিটিয়ে ছেড়েছে। তার প্রমাণ রয়েছে তাদের সমস্ত দেহে।

সব শুনে সর্দার খাঁর রক্তে আগুন ধরে গেলো। সে ঐ মুহূর্তে হুকুম দিলো শ্রমিক কলোনীর সবাইকে পাকড়াও করে আনতে।

যখন শ্রমিক কলোনীতে পুলিশ ফোর্স ছুটলো তখন বনহুর শ্রমিক কলোনীর সবাইকে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছে, যুদ্ধ হবে তবু কেউ ধরা দেবে না।

শ্রমিকদের যার যা আছে তাই নিয়ে ওরা তৈরি হয়ে নিয়েছে। দা-কুঠার-শাবল-খন্তা-কোদাল এমন কি শ্রমিক মেয়েরা পর্যন্ত লাঠিসোটা যা পেয়েছে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে, মরবে তবু মাথা নোয়াবে না।

সুরাইয়া নিজেও অস্ত্র হাতে নিয়েছে।

স্বামীর বিরুদ্ধে সেও সংগ্রাম করবে। সে কিছুতেই এই অন্যায়-অনাচারকে সহ্য করবে না।

শ্রমিক বাহিনী যখন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে রুখে আছে, ঐসময় কয়েকখানা পুলিশ ভ্যান এসে দাঁড়ালো শ্রমিক কলোনীর সামনে।

মাত্র কয়েক সেকেন্ড।

পুলিশ বাহিনী ভ্যান ত্যাগ করে লাফিয়ে পড়লো নীচে, তারপর ঘিরে ফেললো সমস্ত কলোনী। শুরু হলো তুমুল যুদ্ধ।

বনহুর নিজে শ্রমিকদের সম্মুখভাগে থেকে যুদ্ধ পরিচালনা করতে লাগলো।

শ্রমিকদের কাছে কোনো আগ্নেয় অস্ত্র ছিলো না। পুলিশ বাহিনী সবাই আগ্নেয় অস্ত্র নিয়ে এসেছিলো, তাই শ্রমিকদের অনেকে নিহত হলো।

বনহুর একা অনেকগুলো পুলিশ বাহিনী ও সর্দার খাঁর নিজস্ব বাহিনীকে হত্যা করতে সক্ষম হলো। বনহুরের নির্দেশে এবার শ্রমিকগণ আড়ালে আত্মগোপন করে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করলো।

এমন নিপুণভাবে শ্রমিকগণ লড়াই শুরু করলো যার জন্য অল্পক্ষণেই পরাজয় বরণ করলো সর্দার খাঁর লোকজন।

বারবার অপমান হয়ে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলো পুলিশ বাহিনী। তারা যাকে পেলো পাকড়াও করে নিয়ে গেলো। অনেকগুলো শ্রমিক তরুণীকেও সর্দার খাঁর লোক ধরে নিয়ে গেলো সর্দার খাঁর দরবারে।

আবার শ্রমিক কলোনীতে শুরু হলো কান্নাকাটি।

বনহুর এ দৃশ্য সহ্য করতে পারলো না।

সুরাইয়ার চোখেও পানি এসে গেলো। সে শপথ গ্রহণ করলো যেমন করে হোক এর প্রতিকার সে করবে।

❑

আবার আজ সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য এসে হাজির হলো সর্দার খাঁর দরবারে। সাধু বাবাজীর মাথায় ঝাঁকড়া চুল, একমুখ পাকা দাড়ি, দেহে গেরুয়া বসন, হাতে চিমটা, গলায় ও বাজুতে রুদ্রাক্ষর মালা। তরুণ শিষ্যের দেহেও গেরুয়া বসন, চুলগুলো ঝুটি করে মাথায় উপর ভাগে বাঁধা। মুখে কাঁচা দাড়ি, ললাটে চন্দনের তিলক।

সর্দার খাঁ সাধু বাবাজীকে দেখেই সসম্মানে আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়ালো এবং পদস্পর্শ করে কদমবুসি করলো।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য আসন গ্রহণ করার পর আসন গ্রহণ করলো সর্দার খাঁ।

সাধু বাবাজী আজ দরবার চলাকালে গিয়ে হাজির হয়েছে সর্দার খাঁর কাছে।

এমন সময় কয়েকজন পাহারাদার দু'জন বৃদ্ধ শ্রমিককে নিয়ে হাজির হলো। তাদের হাত পিছমোড়া করে বাঁধা। শরীরের স্থানে স্থানে কেটে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চুলগুলো কতক টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। ঠোঁটের পাশ কেটে রক্ত পড়ছে।

সাধু বাবাজী ও তার শিষ্য এদের চিনতে পারলো। এরা দু'জন শ্রমিক সর্দার। বড় নিরীহ এবং মহৎ ব্যক্তি এরা। শ্রমিকদের মঙ্গলই এদের কাম্য।

সর্দার খাঁ কঠিন কণ্ঠে গর্জন করে উঠলো—এই দুই শয়তান শ্রমিকদের দলপতি?

একজন প্রহরী জবাব দিলো—হাঁ মালিক, এ দু'জন শ্রমিকদের দলপতি। এ ছাড়াও আর একজন আছে যুবক শ্রমিক, সে বড় দুর্দান্ত।

কোথায় সে? বজ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করলো সর্দার খাঁ।

অপর প্রহরী জবাব দিলো—তাকে পাকড়াও করা সম্ভব হয়নি।

হুঙ্কার ছাড়লো সর্দার খাঁ—তোমরা সবাই বড় অকেজো! তোমাদের এতোগুলো প্রহরী এবং পুলিশকে ধোঁকা দিয়ে সে সরে পড়লো আর তোমরা...এই দুই অপদার্থকে নিয়ে এসেছো আমার কাছে?

মালিক, সে বড় সুচতুর।

আর তোমরা সবাই বোকা-গর্ধভ!

মালিক!

যাও এদের বন্দী করে রাখো গে। যতক্ষণ সেই সুচতুর দুর্দান্ত যুবকটিকে পাকড়াও করে আনতে না পেরেছো ততক্ষণ এদের কোনো খাবার দিও না এবং দিনে ছয় ঘন্টা এদের উপর নির্যাতন চালাবে। যাও নিয়ে যাও।

একজন প্রহরী বললো—মালিক, এই দুই বৃদ্ধ ছাড়াও আরও পঁচিশ জন বিদ্রোহী শ্রমিককে আমরা পাকড়াও করে এনেছি।

তাদের সবাইকে বন্দী করে রাখো এবং এই দুই বৃদ্ধের সাজা অনুসারে তাদেরকেও সাজা দাও। বলে থামলো সর্দার খাঁ।

প্রথম প্রহরী বললো—মালিক, পাঁচজন তরুণীকেও বন্দী করে এনেছি।

এবার সর্দার খাঁর চোখ দুটোতে লালসাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠলো। বাঁকা চোখে একবার সাধু বাবাজী ও তার শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বললো—তাদের আমার সম্মুখে হাজির করো!

প্রহরীরা বৃদ্ধ শ্রমিক দু'জনকে নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সর্দার খাঁ বললো—এবার সাধু বাবাজী বলুন কি কারণে আপনার আগমন?

সাধু বাবাজী তার পাকা দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললো—আজ বড় এক ভয়ঙ্কর সংবাদ জানাতে এসেছি।

দু'চোখ কপালে তুলে বললো সর্দার খাঁ—সাধু বাবাজী, আপনি সত্যিই ভয়ঙ্কর সংবাদ আমার জন্য বহন করে এনেছেন?

হাঁ সর্দার খাঁ, অচিরেই আপনার..

থামুন সাধু বাবাজী, আমি আর শুনতে চাই না। বলুন কি করে আমি এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে পারি।

সাধু বাবাজী চক দিয়ে মেঝেতে কয়েকটা আঁচড় কেটে বললো—আপনি এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবেন না।

সাধু বাবাজী!

হাঁ, সর্দার খাঁ।

যত টাকা চান দেবো, আপনি আমাকে রক্ষার উপায় বলে দিন।

আমি কিছুতেই আপনাকে রক্ষা করতে পারছি না, কারণ আপনার প্রিয়তমা পত্নীর প্রেতাত্মা সর্বক্ষণ আপনাকে ঘিরে আছে।

তাহলে উপায়?

আপনি তার দৃষ্টি থেকে পরিত্রাণ পাবেন না।

পাবো না?

না।

তাহলে কি করবো সাধু বাবাজী?

আপনি সাধনা করুন।

সাধনা?

হাঁ, সাধনা করতে হবে আপনাকে।

কি করে সাধনা করবো?

সমস্ত অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে আপনাকে।

সর্দার খাঁ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে—অন্যায় কাজ! আমি কোনো অন্যায় কাজ করি না।

হাঁ, আপনি কোন অন্যায় কাজ করেন না সত্য কিন্তু আমার গণনায় আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি প্রতি মুহূর্তে অন্যায় কাজ করে চলেছেন।

মিথ্যা কথা। আপনার গণনা ভুল।

আপনার স্ত্রীকে আপনি হত্যা করেছেন, এটা অন্যায় নয়?

এবার সর্দার খাঁর মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া পড়লো।

সাধু বাবাজী বললো আবার—আপনি যদি আপনার স্ত্রীর প্রেতাত্মার কবল থেকে রক্ষা পেতে চান তাহলে আমার এই শিষ্যটিকে সদাসর্বদা আপনার পাশে রাখবেন এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকবেন।

তাহলে আমি রক্ষা পাবো?

হাঁ পেতে পারেন।

বেশ, তাই হবে। আপনার শিষ্যটিকে আমি সসম্মানে আমার বাসভবনে স্থান দিলাম।

সাধু বাবাজী শিষ্যটিকে লক্ষ্য করে বললো—কি হে, রাজী আছো তো?

শিষ্য মাথা নেড়ে সম্মতি জানালো।

সাধু বাবাজী বললো—সর্দার খাঁ, আমার শিষ্য কিন্তু কথা বলতে পারে না, সে বোবা।

সাধু বাবাজী বিদায় গ্রহণ করলো।

শিষ্য রয়ে গেলো সর্দার খাঁর বাসভবনে।

দরবার শেষ হলো।

কয়েকজন প্রহরী কয়েকটা শ্রমিক তরুণীকে সঙ্গে করে হাজির হলো।

শিষ্য তাকিয়ে দেখলো তরুণীদল সবাই গরীব শ্রমিকদের স্ত্রী-কন্যা-বোন। এক একজনের দেহের বসন ছিন্ন-ভিন্ন, প্রায় অর্ধ উলঙ্গ সবাই।

সর্দার খাঁর মনে পাপ বাসনা মাথাচাঁড়া দিয়ে উঠলো। সে প্রহরীগণকে বললো—প্রহরীগণ, তোমরা এদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি সুন্দরী তাকে আমার বিশ্রামাগারে পাঠিয়ে দাও। তারপর তাকালো সাধু বাবাজীর শিষ্যের দিকে—আপনি যান, বিশ্রাম করুন গে। অপর একজন কর্মচারীকে লক্ষ্য করে বললো—এঁকে নিয়ে যান, এঁর বিশ্রামকক্ষ দেখিয়ে দেন।

শিষ্যকে সঙ্গে করে কর্মচারী চলে গেলো।

সর্দার খাঁ চলে গেলো তার বিশ্রামাগারের দিকে। দু'চোখে তার লালসাপূর্ণ ভাব ফুটে উঠেছে। খুশীমনে সে এগিয়ে চলেছে, ভুলে গেছে সর্দার খাঁ সাধু বাবাজীর কথা।

বিশ্রামাগারে প্রবেশ করে সর্দার খাঁ তার টেবিলের সম্মুখে দাঁড়ায়। টেবিলে মূল্যবান বিলেতী মদের বোতল ও খালি গ্লাস থরে থরে সাজানো

রয়েছে। সর্দার খাঁ মদের বোতল তুলে নিলো হাতে-তারপর একটা গ্লাসে ঢাললো।

কয়েক গ্লাস গলধঃকরণ করে তাকালো সম্মুখে। দেখলো দু'জন প্রহরী একটি তরুণীকে সঙ্গে সরে দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাশে।

সর্দার খাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো জ্বলজ্বল করে। মদের নেশায় চোখ দুটো তার জ্বলছে। টলতে টলতে এগিয়ে গেলো সে তরুণীটির পাশে। তরুণী তার ওড়না দিয়ে মুখখানাকে ঢেকে রেখেছে ভাল ভাবে।

সর্দার খাঁ তার প্রহরীকে বেরিয়ে যাবার জন্য ইংগিত করলো।

প্রহরী দু'জন বেরিয়ে গেলো বিশ্রাম কক্ষ থেকে।

সর্দার খাঁ দু'হাত প্রসারিত করে তরুণীকে জাপ্‌টে ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা সরিয়ে ফেললো সে ওর মুখ থেকে, মুহূর্তে ভূত দেখার মত আঁতকে উঠলো। অস্ফুট ভয়ার্তকণ্ঠে উচ্চারণ করলো, সুরাইয়া, তুমি বেঁচে আছো...

সুরাইয়াই একজন শ্রমিক কন্যা বেশে হাজির হয়েছিলো স্বামী সর্দার খাঁর সম্মুখে।

সর্দার খাঁ সুরাইয়াকে অত্যন্ত ভয় করে চলতো। তাকে গোপনে হত্যা করে সে যথেচ্ছাচারণে প্রবৃত্ত হয়েছিলো। হঠাৎ সেই মৃত পত্নীর আবির্ভাবে একেবারে হকচকিয়ে যায় সর্দার খাঁ।

সুরাইয়া যে জীবিত আছে সর্দার খাঁ এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলো না! সে তাকালো ওর দিকে, মুখমন্ডল ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছে!

সুরাইয়া এবার কথা বললো—আমি বেঁচে আছি এবং তোমার সব কীর্তিই আমি লক্ষ্য করেছি। তুমি আমাকে হত্যা করে তোমার মনবাসনা পূর্ণ করতে চেয়েছো......

সর্দার খাঁ সুরাইয়ার পায়ের কাছে বসে পড়ে বলে—তুমি আমাকে ক্ষমা করো সুরাইয়া, আমাকে ক্ষমা করো...

না, আমি তোমাকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারি না, কারণ তুমি আমাকে হত্যা করেছো?

সুরাইয়া!

না, তুমি আমার স্বামী নও।

আমাকে ক্ষমা করবে না তাহলে?

ক্ষমার যোগ্য তুমি নও।

এবার সর্দার খাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত পিষে বললো—আমিও তাহলে তোমাকে বাঁচতে দেবো না। এই মুহূর্তে তোমাকে হত্যা করবো। লোকে জানে, তুমি নিরুদ্দেশ হয়েছো। তুমি বেঁচে আছো একথা কেউ জানে না, এই দন্ডে তোমাকে হত্যা করে নদীগর্ভে নিক্ষেপ করবো। কেউ জানবে না। তোমাকে আমি সহস্তে হত্যা করলাম। সর্দার খাঁ সুরাইয়ার গলা টিপে ধরার জন্য দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যায়।

সুরাইয়া পিছু হটতে থাকে।

সর্দার খাঁর দু'চোখ দিয়ে যেন আগুন টিকরে বের হচ্ছে। নিশ্বাস যেন অগ্নি শিখা। দাঁতগুলো যেন নরখাদক রাক্ষসের দাঁত। সেকি ভয়ঙ্কর মূর্তি!

আর কয়েক মুহূর্ত তাহলেই সর্দার খাঁ এবার সত্যি সত্যি সুরাইয়াকে গলা টিপে হত্যা করে ফেলে।

ঠিক সেই সময় জমকালো পোশাক পরা এক ব্যক্তি প্রবেশ করে সেই কক্ষে, বজ্রকঠিন কণ্ঠে বলে—খবরদার, একচুল আর অগ্রসর হবেনা।

সর্দার খাঁ থমকে দাঁড়ালো।

বিস্ময়ভরা দৃষ্টি নিয়ে তাকালো সে জমকালো পোশাক পরা লোকটার দিকে। প্রথমে হকচকিয়ে গেলেও পরক্ষণে রুখে দাঁড়ালো, কঠিন গলায় বললো—কে তুমি?

আমি তোমার আজরাইল, জান নিতে এসেছি। বললো জমকালো পোশাক পরা লোকটা।

সুরাইয়াও কম অবাক হয়নি। সে ভাবছে, কে এই লোক যে তাকে এমনভাবে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচালো।

সর্দার খাঁ একটা বিদ্রুপ পূর্ণ শব্দ করে বললো—আমার আজরাইল তুমি! তুমি ডাকাত......কথাটা বলে হাতে তালি দেয় সর্দার খাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে কক্ষের চারপাশের দরজা খুলে যায়।

কক্ষের দরজাগুলো দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করে অগণিত সশস্ত্র প্রহরী। তারা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করে ঘিরে ফেলে জমকালো পোশাক পরা লোকটাকে।

ক্ষণিকের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়ায় জমকালো পোশাক পরা লোকটা, তার চোখে এক অপূর্ব দীপ্ত ভাব ফুটে উঠে। ঝাঁপিয়ে পড়ে সে একজন প্রহরীর উপর, তাকে ধরাশায়ী করেই অপর এক ব্যক্তিকে প্রচন্ড ঘুষি দিয়ে দূরে নিক্ষেপ করে। তারপর যেমন এসেছিলো তেমনি দ্রুত বেরিয়ে যায় সে বাইরে।

সর্দার খাঁ হুকুম দেয়—এই মুহূর্তে ঐ ডাকাতকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসো।

সবাই ছুটলো বাইরে।

কিন্তু বাইরের অন্ধকারে কাউকেই পাওয়া গেলো না। বিফল মনোরম হয়ে ফিরে এলো প্রহরীরা।

সর্দার খাঁ আদেশ দিলো সুরাইয়াকে বন্দী করে ফেলতে।

প্রহরীগণ সুরাইয়াকে বন্দী করে ফেললো। নিয়ে গেলো তাকে অন্ধকার কারাকক্ষে। সর্দার খাঁ আবার শুরু করলো তার কুকর্ম।

❑

বনহুরকে একা ফিরে আসতে দেখে নাসিমা ব্যাকুল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলো—হাসান ভাই, আপনি একা কেনো? বোন সুরাইয়া কোথায়?

বনহুর গম্ভীর অথচ শান্ত গলায় বললো—সে তার স্বামীর বন্দীশালায় আটকা পড়েছে।

অবাক কণ্ঠে বললো নাসিমা—সর্দার খাঁ তাকে আটক করেছে!

হাঁ, নাসিমা।

তাহলে উপায়? শুনেছি তার স্বামী নাকি তাকে হত্যা করার চেষ্টা করেছিলো?

হত্যা করার চেষ্টা নয় তাকে শয়তান হত্যাই করেছিলো কিন্তু সে ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেছে।

হাসান ভাই, আপনি তাকে উদ্ধার করুন। নাহলে ঐ শয়তান সর্দার খাঁ......

তাকে হত্যা করবে।

হাঁ, হাসান ভাই।

বনহুর দেহ থেকে জামা খুলতে খুলতে বললো—শুধু সুরাইয়াই নয়, সর্দার খাঁর বন্দীশালায় বহু নিরীহ শ্রমিক আটকা পড়েছে। সর্দার খাঁ হুকুম দিয়েছে যতক্ষণ না শ্রমিকদের বিদ্রোহী যুবককে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে ততক্ষণ তাদের মুখে কোন খাদ্য যেন না পড়ে।

নাসিমা বলে উঠলো—শ্রমিকদের বিদ্রোহী যুবক কে? যাকে গ্রেপ্তার করতে না পারলে সর্দার খাঁ তার বন্দীশালায়বন্দীদের খেতে দেবে না?

বনহুর একটা পাথর খণ্ডে বসে পড়ে বললো—সেই বিদ্রোহী যুবক তোমার হাসান ভাই নাসিমা।

আপনি! আপনি বিদ্রোহী শ্রমিক......

হাঁ, নাসিমা আমিই......

তাহলে?

আমি সর্দার খাঁর কাছে ধরা দেবো।

আপনি ধরা দেবেন?

তা ছাড়া কোনো উপায় দেখছি না নাসিমা?

হাসান ভাই, আপনিই বলেছেন সর্দার খাঁ জল্লাদ। সে আপনাকে হাতের মুঠায় পেলে সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে।

হয়তো করবে কিন্তু কোনো উপায় তো দেখছি না। আজ দু'দিন হলো সর্দার খাঁ শ্রমিক কলোনী থেকে সমস্ত শ্রমিকদের পাকড়াও করে নিয়ে গেছে। শুধু তাই নয়, বৃদ্ধ শ্রমিক দু'জনকেও পাষন্ড ধরে নিয়ে গেছে এবং তাদের কাউকেই সে খেতে দেয় নি। এ ছাড়াও তাদের উপর চালানো হচ্ছে অকথ্য অত্যাচার। কথাগুলো বলে থামলো বনহুর।

নাসিমা স্থিরদৃষ্টি মেলে তাকিয়েছিলো বনহুরের মুখের দিকে। চোখেমুখে তার দারুণ উৎকণ্ঠা আর দুশ্চিন্তার ছায়া।

বনহুর বললো—নাসিমা, ধরা আমাকে দিতেই হবে, না'হলে শত শত নিরীহ শ্রমিক না খেয়ে তিলতিল করে শুকিয়ে মরবে। না না, আমি পারবো না এসব সহ্য করতে।

হাসান ভাই! দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে নাসিমা।

বনহুর ওর মাথায় হাত বুলিয়ে বলে—নাসিমা, জানি তোমার কষ্ট হবে। হয়তো ফিরে আর নাও আসতে পারি......

হাসান ভাই, আমি আপনাকে একা যেতে দেবো না, আমাকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন।

তা কি সম্ভব? আমি তোমার জন্য সব ব্যবস্থা করে যাবো নাসিমা। বাংলাদেশে ফিরে যেতে তোমার কোনো কষ্ট হবে না।

তা আমি চাইনা হাসান ভাই।

নাসিমা, তুমি বড্ড ছেলেমানুষ। একটি কথা মনে রেখো, তোমার হাসান ভাইকে যদি হত্যা না করে বন্দী করে রাখে তাহলে সে সব বাধা অতিক্রম করে ঠিক তোমার পাশে এসে হাজির হবে। তুমি আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও বোন। একি, তুমি কাঁদছো!

বনহুর নাসিমাকে গভীর স্নেহে কাছে টেনে নেয়।

নাসিমা বনহুরের বুকে মাথা রাখলো। সে কি এক অনাবিল অনুভূতি। নাসিমার সমস্ত দেহমনে শিহরণ জাগলো, সে নিজকে হারিয়ে ফেললো যেন।

বনহুর বললো—বোন, আমি জানি তুমি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসো। তোমার ভালবাসার কোন প্রতিদান আমি তোমাকে দিতে পারিনি কোনোদিন, তবু তুমি আমাকে.....

চুপ করুন হাসান ভাই, চুপ করুন। আপনি আমাকে যা দিয়েছেন তা কোনোদিন ভুলবো না। হাসান ভাই, একটি কথা বলবো, রাখবেন?

বলো, রাখবো।

বাইরে আকাশে ভীষণ মেঘ করেছে; বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, বড্ড ভয় করছে আমার, আজ রাত আপনি কোথাও যাবেন না।

একটু হেসে বললো বনহুর– ও এই কথা। বেশ তুমি যদি ভয় পাও নিশ্চয়ই আমি যাবো না। কিন্তু কাল আমাকে যেতেই হবে।

নাসিমা কোনো কথা বলে না।

বনহুর বলে—সন্ধ্যার অন্ধকার জমাট বেঁধে আসছে, আলো জ্বালো নাসিমা।

নাসিমা লণ্ঠন জ্বাললো।

বাইরে তখন ভীষণভাবে মেঘ গর্জন শুরু করেছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে, ঝড় শুরু হবার পূর্ব লক্ষণ এটা।

নাসিমা লণ্ঠন জ্বেলে বনহুরের পাশে এসে বসলো, চোখে মুখে তার ভয়াতুর ভাব।

ঠিক ঐ মুহূর্তে কোথাও বাজ পড়লো।

নাসিমা ভয়-বিহবলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের বুকে।

বনহুর ওকে সস্নেহে কাছে টেনে নিলো।

প্রচন্ড ঝড়ের বেগ আরও বাড়ছে।

ঝমঝম করে বৃষ্টি শুরু হলো।

রাত বাড়ছে।

বনহুর আর নাসিমা নির্জন গুহায় দুটি প্রাণী। গুহার মুখ না থাকায় ঝরের ঝাপটা গুহার মধ্যে প্রবেশ করছিলো।

কখন যে নাসিমা বনহুরের কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। হঠাৎ ঘুম ভেংগে যায় নাসিমার, চোখ মেলে তাকাতেই এক আনন্দ অনুভূতি তাকে আপ্লুত করে ফেলে। বনহুরের কোলে তার মাথা, বনহুর গুহার দেয়ালে ঠেশ দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

নাসিমা ইচ্ছা করেই চুপচাপ শুয়ে থাকে। বড় ভাল লাগে ওর। মনে হয় যুগ যুগ যদি সে এমনি করে ওর কোলে মাথা রেখে ঘুমাতে পারতো।

এক সময় ভোর হয়ে আসে।

ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের।

ভোরের আলো গুহার মধ্যে এসে পড়েছে।

আকাশ পরিস্কার।

কোথাও মেঘের চিহ্ন নেই।

একটা ঠান্ডা বাতাস শরীরে কাঁপন লাগাচ্ছে। নাসিমা কখন আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলো। ঠান্ডায় শরীরটা তার কুঁকড়ে গেছে। জড়ো সড়ো হয়ে আছে সে, বনহুর নাসিমার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে আঁচলটা ভাল করে ওর গায়ে ঢাকা দিয়ে উঠে দাঁড়ায়।

বেরিয়ে আসে বাইরে বনহুর।

ভোর হলেও এখনও সূর্য পূর্বাকাশ আলোকিত করে উঁকি দেয় নি। পর্বতের গায়ে এখনও বৃষ্টির জলের ছোঁয়া লেগে রয়েছে।

এক ঝাঁক শুভ্র বলাকা উড়ে চলেছে পর্বতের পাশ কেটে। বনহুর নিষ্পলক নয়নে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলো তারপর নেমে পড়লো পর্বতের গা বেয়ে নীচে।

নাসিমা ঘুমিয়ে আছে নিশ্চিন্ত মনে।

বনহুর এগিয়ে চলেছে।

সর্দার খাঁর সম্মুখে হাজির হবে সে। বনহুর ঠিক সেই যুবক শ্রমিকের বেশে সজ্জিত হয়ে গিয়েছিলো যাতে তাকে ভুল না করে।

সর্দার খাঁর নিকটে হাজির হবার আগে বনহুর শ্রমিক কলোনীতে গিয়ে হাজির হলো। সেখানে এখনও বহু শ্রমিক নারী এবং শিশু রয়েছে। তারা আজ ক'দিন না খেয়ে রয়েছে। বাড়িঘর আশ্রয় কিছু নেই তাদের।

বনহুরকে দেখিবামাত্র তারা আনন্দিত হয়ে উঠলো। এতো দুঃখ-বেদনার মধ্যেও তারা আশার আলো দেখতে পেলো।

বনহুর এদের জন্য প্রচুর খাবার নিয়ে গিয়েছিলো। খাবারগুলো সে নিজের হাতে শ্রমিকদের মা-বোন-সন্তানদের মধ্যে বিতরণ করলো।

একজন বৃদ্ধা শ্রমিকমাতা বনহুরকে বললো—বাবা, তুমি যদি এই মুহূর্তে খাবার এনে না দিতে তাহলে আমরা সবাই মরে যেতাম। আমাদের ছেলেপুলে সবাই মরতো। বাবা তুমি আমাদের রক্ষাকারী......

বৃদ্ধার কথায় বনহুরের চোখে পানি এসে যায়, বলে সে—খোদা তোমাদের রক্ষাকারী, আমি নই মা।

এমন সময় আর এক বৃদ্ধা এসে কেঁদে পড়ে—বাবা, আমার একমাত্র ছেলেকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। আমরা ওকে ছাড়া বাঁচতে পারি না। ওর বাবা অন্ধ, আমি বৃদ্ধা। বৌ আছে, তার চারটি ছেলেমেয়ে, সবাই ছোট ছোট। বলো বাবা আমরা কি করে বাঁচবো? সেই তো উপার্জ্জন করতো আমরা সবাই তাই খেয়ে বাঁচতাম।

আর এক বুড়ো এসে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলো—আমাকে বাঁচাও বাবা, আমাকে বাঁচাও। আমার মেয়েকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে। আমার মেয়ে কাজ করে এনে আমাকে খাওয়াতো, আমি আজ দু'দিন হলো না খেয়ে আছি।

বনহুরকে ঘিরে ধরলো শ্রমিকদের বৃদ্ধা মা, বৃদ্ধা বাবা এবং অসহায়া স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, আত্মীয় স্বজন।

বনহুর সান্ত্বনা দিয়ে বললো—সবাই প্রতীক্ষা করো, আমি তাদের মুক্ত করে দেবো। তোমরা হয়তো শুননি আমাকে পাকড়াও করতে পারলে সর্দার খাঁ তোমাদের ছেলে, স্বামী এবং বৃদ্ধ দুটি সর্দারকে খেতে দেবে। যতক্ষণ না আমাকে সে পাকড়াও করতে পেরেছে ততক্ষণ সবাইকে অনাহারে কষ্ট দিচ্ছে। আর চালাচ্ছে অকথ্য অত্যাচার।

বনহুরের কথা শুনে সকলের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হলো। সবাই কেঁদে পড়লো, না না তোমাকে আমরা বন্দী হতে দেবো না। আমাদের ছেলে, স্বামী সর্দার সবাই যাক, তবু তোমাকে আমরা সর্দার খাঁর নিকটে যেতে দেবো না। ও তোমাকে পেলে হত্যা করে ফেলবে।

বনহুরকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালবাসে, তাই বৃদ্ধ, বৃদ্ধা ও নারী-শিশু সবাই মিলে বনহুরকে ঘিরে ধরে।

বনহুরকে অনেক বাধা দিয়েও তারা আটকে রাখতে পারে না, সে সোজা চলে যায় সর্দার খাঁর দরবারে।

সর্দার খাঁ তখন দরবার কক্ষে বসেছিল। তার সম্মুখে সেই বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার দু'জনকে নির্মমভাবে প্রহার করা হচ্ছিলো। চারপাশে ঘিরে আছে সশস্ত্র প্রহরী। অগ্নি মূর্তিধারণ করেছে সর্দার খাঁ।

সর্দার খাঁ গর্জন করে বলছে—জবাব দাও কে সেই যুবক শ্রমিক, কোথায় থাকে সে? কি তার নাম?

বলবো না! কঠিন দৃঢ়কণ্ঠে জবাব দিলো বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার।

সঙ্গে সঙ্গে কষাঘাত এসে পড়লো তার পিঠে।

যন্ত্রণায় বিকৃত করলো শ্রমিক সর্দার মুখখানা। আবার প্রশ্ন করলো সর্দার খাঁ—জবাব দাও, সেই যুবক কোথায়?

বলবো না! পুনরায় সেই বলিষ্ঠ কণ্ঠ—বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দারের।

আবার আঘাতের পর আঘাত।

ঠিক ঐ মুহূর্তে বনহুর শ্রমিকের বেশে প্রবেশ করে সেই দরবারকক্ষে।

ঐ দন্ডে শয়তান সর্দার খাঁর প্রধান অনুচর বলে উঠে—খাঁ সাহেব, এই সেই শ্রমিক যুবক।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার খাঁ ফিরে তাকায়।

বনহুরের মুখে দৃষ্টি পড়তেই দু'চোখ তার অগ্নিবর্ণ হয়ে উঠে। এই সেই যুবক, যার প্রচন্ড আক্রমণে তার দুর্দান্ত প্রহরী ও ফাংহা-পুলিশ বাহিনী কম হয়রান হয়নি। তার বহু লোককে সে হত্যাও করেছে। যাকে পাকড়াও করার জন্য তার এতো প্রচেষ্টা সেই দুর্ধর্ষ শ্রমিক যুবক তারই দরবারে স্বয়ং হাজির, কম কথা নয়।

সর্দার খাঁর চোখেমুখে বিস্ময়।

বনহুর সর্দার খাঁর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার দু'জনকে তখন প্রহার থেকে ক্ষান্ত রাখা হয়েছিলো।

বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার দু'জন বনহুরকে দেখে একেবারে মুষড়ে পড়েছিলো। তারা চেয়েছিলো নিজেরা মরবে তবু তাদের প্রিয় শ্রমিক বন্ধুটিকে বিপদে ফেলবে না। কিন্তু একি হলো, যে ভয় তারা সর্বক্ষণ করতো সেই ভয়ই হলো তাদের কাল। শ্রমিক যুবক সর্দার খাঁর দরবারে নিজে এসে ধরা দিচ্ছে।

সর্দার খাঁ কিছু প্রশ্ন করার আগেই বললো বনহুর—আমি এসেছি, এবার সব বন্দীদের খেতে দেওয়া হোক।

সর্দার খাঁ তার প্রহরীদের ইংগিত করলো বনহুরকে গ্রেপ্তার করে ফেলতে।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার খাঁর প্রহরী বনহুরকে ঘিরে ফেললো।

বন্দী করে ফেললো তাকে।

বনহুর তাদের কোনো বাধা দিলো না।

এবার সর্দার খাঁ দাঁতে দাঁত পিষে বললো—সেবার রাণী সুরাইয়ার নেক নজরে পড়ে মুক্তি পেয়েছিলে। এবার কে তোমাকে মুক্তি দেয় দেখে নেবো। প্রহরীদের লক্ষ্য করে বলে—নিয়ে যাও একে, কারাকক্ষে বন্দী করে রাখো। কাল সকালে সমস্ত শ্রমিক বন্দীর সম্মুখে একে গুলী করে হত্যা করা হবে।

শ্রমিক বৃদ্ধ সর্দার দু'জনার মুখ কালো হয়ে উঠলো।

ততক্ষণে সর্দার খাঁর প্রহরীরা বনহুরকে গ্রেপ্তার করে বন্দীশালার দিকে নিয়ে চললো।

বনহুর শ্রমিকদের মুক্তির জন্য নিজকে তুলে দিলো এক চরম পরিণতির মুখে।

❑

শুষ্ক কঠিন পাথরের মেঝেতে আজ সুরাইয়ার স্থান। দুগ্ধ ফেননিভ শুভ্র বিছানায় সে চিরকাল ঘুমিয়েছে—আজ সে অসহায়া ,করুণ তার অবস্থা। দু'দিন দু'রাত তাকে খেতে দেওয়া হয়নি। অন্যান্য শ্রমিকের সঙ্গে তাকেও কঠিন শাস্তি দেওয়া হয়েছে এবং খাওয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যতক্ষণ বিদ্রোহী শ্রমিক যুবকটিকে পাকড়াও করা সম্ভব না হবে ততক্ষণ তাদের মুখে পানিবিন্দু পর্যন্ত দেওয়া হবে না, সুরাইয়া এ খবর জানতো।

না খেয়ে মরতে রাজী আছে সুরাইয়া তবু তার প্রাণরক্ষাকারী সেই বিদ্রোহী শ্রমিক যুবককে গ্রেপ্তার হতে দিতে পারে না সে।

সুরাইয়া নামায পড়ে দোয়া করে, হে খোদা—তাকে তুমি রক্ষা করো। দু'হাত তুলে মোনাজাত করে সে।

ঠিক ঐ মুহূর্তে তার কারাকক্ষের দরজা খুলে যায়।

বিস্ময় দৃষ্টি নিয়ে তাকায় সুরাইয়া, কেননা আজ ক'দিন তাকে বন্দী করে রাখার পর কেউ আসেনি তার কারাকক্ষে। দরজাটাও কেউ খুলে দেখেনি সে কেমন আছে। আজ হঠাৎ দরজা খুলে যাওয়ায় চোখ তুলে তাকায়, অবাক হয় সে, দেখতে পায় দু'জন প্রহরী কিছু খাবার নিয়ে তার কারাকক্ষে প্রবেশ করেছে।

সুরাইয়ার বুকটা ধক্ করে উঠে। সে জানে, যতক্ষণ না ওকে পাকড়াও করা সম্ভব হবে, ততক্ষণ কোনো বন্দীকে খেতে দেওয়া হবে না। তবে কি ও গ্রেপ্তার হয়েছে? প্রশ্ন জাগে সুরাইয়ার মনে।

প্রহরীদ্বয় খাবার এনে সুরাইয়ার সম্মুখে রাখে।

সুরাইয়া মুখ তুলে তাকালো, বললো—তোমরা খেতে দিচ্ছো কেন? তোমরা কি তাকে গ্রেপ্তার করেছো?

সুরাইয়ার প্রশ্নের জবাবে বললো, একজন প্রহরী—হাঁ, তাকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি।

সুরাইয়া বিস্ময়ভরা কণ্ঠে বললো—মিথ্যা কথা, তাকে তোমরা কিছুতেই গ্রেপ্তার করতে পারবে না, আমি জানি।

প্রহরী বললো—সে নিজে এসে ধরা দিয়েছে, তাকে গ্রেপ্তার করতে হয়নি।

সুরাইয়া অস্ফুট কণ্ঠে বললো—সে নিজে এসে ধরা দিয়েছে?

হাঁ।

আশ্চর্য মানুষ সে।

হাঁ রাণীজী, বড় আশ্চর্য। আমরা দু'তিন শ' লোক তাকে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হই-নি অথচ সে নিজে সর্দার খাঁর দরবারে হাজির হয়ে নিজকে আমাদের হাতে তুলে দিলো।

দ্বিতীয় প্রহরী বললো—আরও আশ্চর্য, তাকে গ্রেপ্তারের সময় সে একটুও টু শব্দ করলো না। এমন কি তার মুখোভাবেও কোনো পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়নি।

সুরাইয়ার মুখখানা শান্ত গম্ভীর হয়ে উঠলো, বললো—বুঝতে পেরেছি বন্দীদের খেতে না দেওয়ায় সে নিজে এসে ধরা দিয়েছে। নিয়ে যাও তোমরা, ও খাবার আমি কিছুতেই খাবোনা।

সেকি রাণীজী, আপনি পুরো দু'দিন দু'রাত কিছু খাননি অথচ বলছেন খাবেন না, তা কেমন করে হয়। বললো—প্রথম প্রহরী।

দ্বিতীয় প্রহরী বললো—না খেয়ে মরে যাবেন রাণীজী।

মরতে দাও, আমি খাবোনা।

রাণীজী আমরা সবাই আপনাকে ভালবাসি রাণীজী। আপনি আমাদের মা।

মা!

হাঁ রাণীজী।

তাহলে আমি যা বলবো শুনবে তোমরা?

বলুন রাণীজী।

সেই বিদ্রোহী শ্রমিক কোথায়? কোথায় তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে? কি অবস্থায় সে আছে? বলো, এই সংবাদ আমি জানতে চাই?

রাণীজী, তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। কাল সকালে সমস্ত বন্দী শ্রমিকের সম্মুখে তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে।

তাকে গুলী করে হত্যা করা হবে?

হাঁ! সর্দার খাঁর হুকুম তাকে গুলি করে হত্যা করা হবে।

না না, তাকে হত্যা করতে দেবো না আমি।

রাণীজী, সে বড় দুর্দান্ত, বড় দুর্ধর্ষ, অনেক কষ্টে তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়েছে। তবু সে নিজে এসে ধরা দিয়েছে, না হলে তাকে গ্রেপ্তার করা কিছুতেই সম্ভব হয়ে উঠতো না।

দ্বিতীয় প্রহরী বললো—ওকে গ্রেপ্তার করা না হলে কোন বন্দীই খাবার পেতো না। বন্দীরা না খেয়ে মৃতের ন্যায় হয়ে পড়েছিলো। রাণীজী পানি পর্যন্ত তাদের খেতে দেওয়া হয়নি।

প্রথম প্রহরী বললো—রাণীজী, আপনিতো নিজেও কিছু খেতে পাননি কারণ সর্দার খাঁর হুকুম কাউকে যেন পানি পর্যন্ত না দেওয়া হয়।

আমি চাইনা, আজও আমি কিছু খেতে চাই না। নিয়ে যাও। নিয়ে যাও তোমরা এ খাবার।

সেকি রাণীজী?

আমি খাবোনা। নিয়ে যাও, নিয়ে যাও তোমরা।

রাণীজী আপনি না খেয়ে মরে যাবেন যে?

মরতে দাও। এমন বেঁচে থাকার চেয়ে মরা ভাল।

ওরা দু'জন খাবার নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

সুরাইয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে বালিকার মত কাঁদতে লাগলো, আপন মনে সে বলতে লাগলো—ওগো বন্ধু, কেনো তুমি আমাদের বাঁচানোর জন্য ঐ বন পশুর হাতে নিজকে সমর্পণ করলে? তুমি কি জানোনা ওর কবল থেকে আর তুমি রক্ষা পাবেনা। তুমি আমাকে মৃত্যুর মুখ থেকে বাঁচিয়ে ছিলে আবার তুমি আমাদের বাঁচাতে এসেছো নিজের জীবনকে বিসর্জন দিয়ে......

সুরাইয়ার দু'চোখের পানিতে বুকের কাছে বস্ত্রাচঞ্চল সিক্ত হয়ে উঠলো। বনহুরের সুন্দর বলিষ্ঠ মুখ বার বার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগলো।

ওদিকে প্রহরীদ্বয় সর্দার খাঁর নিকটে হাজির হলো।

সর্দার খাঁ তখন বন্দীকক্ষে প্রবেশ করে; বন্দীদের কঠোর শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করছিলো!

বনহুরের হাত দু'খানা শিকল দিয়ে বেঁধে দু'পাশে টেনে রাখা হয়েছিলো। দেহ জামা শূন্য করা হয়েছে। এখন তার শরীরে কশাঘাত করা হবে।

ঝকঝকে চাবুক হাতে দাঁড়িয়ে আছে ভীষণ চেহারার এক নিগ্রো প্রহরী। চোখ দুটোতে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। শরীরের রং জমকালো, দাঁতগুলো সাদা ধপ ধপে এবং বেশ বড় বড়। ঠিক যেন একটি জীবন্ত যমদূত।

প্রহরী সর্দার খাঁর নির্দেশের অপেক্ষা করছে।

আরও কয়েকজন আছে তার আশে-পাশে, তারা সবাই সর্দার খাঁর অনুচর।

প্রহরীদ্বয় সর্দার খাঁকে কুর্নিশ জানিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

সর্দার খাঁ প্রশ্ন করলো—কি সংবাদ বলো?

প্রথম প্রহরী বললো—মালিক রাণীজী কিছু মুখে দিলেন না।

দ্বিতীয় প্রহরী বললো—আমরা অনেক অনুরোধ করেছি কিন্তু কিছু খেলেন না তিনি।

কেনো, কেনো খাবেনা? কেনো খেলোনা সে?

বলছেন যাকে গ্রেপ্তার করার পর খেতে দেওয়া হলো তাকে মুক্তি না দিলে তিনি কিছুতেই খাবেননা।

সঙ্গে সঙ্গে চোখ দুটো তার বনহুরেরই মুখে এসে স্থির হলো। ক্রুদ্ধ সিংহের মত হুঙ্কার ছেড়ে বললো—ওকে ছেড়ে দেবো আমি? হাঃ হাঃ হাঃ যাকে গ্রেপ্তার করার জন্য আমার এতো প্রচেষ্টা। মরে যেতে দাও, না খেয়ে রাণী সুরাইয়াকে মরে যেতে দাও।

বনহুর ফিরে তাকায় সর্দার খাঁর মুখের দিকে। সে বুঝতে পারে রাণী সুরাইয়াকেও শয়তান সর্দার খাঁ খেতে দেয়নি। তাকে বন্দী করার পর তবেই খেতে দেওয়া হয়েছিলো কিন্তু সে তা খায়নি।

অবাক হয়ে গেলো বনহুর, তাকে মুক্তি না দিয়ে সুরাইয়া খাবেনা। আজ দু'দিন দু'রাত কিছু খায়নি। এমন কি পানি পর্যন্ত তাদেরকে খেতে দেওয়া হয়নি জানে বনহুর। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেলো তার। না খেয়ে কতক্ষণ মানুষ বাঁচতে পারে।

সর্দার খাঁর কথায় সম্বিৎ ফিরে পায় বনহুর। সর্দার খাঁ কর্কশ কণ্ঠে বলে—যুবক তুমি আমার স্ত্রীকে যাদু করেছো, না হলে সে তোমার প্রতি এতো আসক্ত কেনো?

বনহুর কোনো জবাব দেয় না।

পুনরায় প্রশ্ন করে সর্দার খাঁ—বলো কি করেছো তাকে?

তবু বনহুর নীরব।

সর্দার খাঁ আদেশ দেয়—লাগাও চাবুক।

অমনি সেই যমদূতের মত নিগ্রো প্রহরী তার হস্তস্থিত চাবুক দিয়ে সপাং করে বনহুরের দেহে আঘাত করলো।

বনহুর দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটখানা কাঁমড়ে ধরলো কোন শব্দ তার মুখ দিয়ে বের হলো না।

সর্দার খাঁ আবার তাকে লক্ষ্য করে বললো—যদি আমার স্ত্রী তোমার কথা ভুলে না যায় তাহলে তোমাকে এর চেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।

বনহুর কোন উত্তর দিলো না।

সর্দার খাঁ পুনরায় আঘাত করার জন্য ইঙ্গিত করলো।

সঙ্গে সঙ্গে আবার বনহুরের দেহে চাবুক এসে পড়লো।

চাবুকের আঘাতে রক্ত বেরিয়ে পড়লো তার সুন্দর বলিষ্ঠ দেহ থেকে।

সর্দার খাঁ বললো—যাও সুরাইয়াকে এখানে নিয়ে এসো। ওর সম্মুখে এর চামড়া চাবুকের আঘাতে ছিড়ে ফেলো।

প্রহরীদ্বয় চলে গেলো।

অল্পক্ষণ পর তারা ফিরে এলো সুরাইয়াকে সঙ্গে করে। সুরাইয়ার চুল এলায়িত। বস্ত্রাঞ্চল ভূলুণ্ঠিত, মুখমন্ডল শুষ্ক। দু'দিন দু'রাত সম্পূর্ণ অনাহারে ক্ষুধা পিপাসায় কাতর সে!

প্রহরীদ্বয় তাকে পাকড়াও করে নিয়ে এলো।

বন্দীশালায় প্রবেশ করেই বনহুরের মুখে নজর পড়লো তার। বনহুরের অবস্থা দেখে সে দু'হাতে চোখ ঢেকে ফেললো। দেহের কয়েক জায়গা কেটে রক্ত পড়ছে। দু'হাত দু'পাশে টানা দিয়ে বাঁধা।

সুরাইয়া ধীরে ধীরে চোখের হাত সরিয়ে নিলো তারপর স্বামী সর্দার খাঁর মুখে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললো—শয়তান পাষন্ড পশু একে তুমি এভাবে নির্যাতন করছো কেনো? কেনো তুমি একে শাস্তি দিচ্ছো?

সর্দার খাঁ হুঙ্কার ছেড়ে বললো—কেনো একে শাস্তি দিচ্ছি জানো না? আমার দেশের সমস্ত শ্রমিকদের এ বিদ্রোহী করে তুলেছে। এ কথা কি তুমি ভুলে গেছো?

ভুলিনি। ভুলিনি তুমি শ্রমিকদের উপর কি নির্মম অত্যাচার করছো। ভুলিনি তোমার কোন পাপ কর্মের কথা। সব আমি নিজের চোখে দেখেছি......

না না আমি কোন পাপ কর্ম করিনি। যা ন্যায় তাই আমি করেছি। শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিয়েছি তার দাম দিয়েছি। শ্রমিকদের খেতে দিয়েছি, অসুখে ঔষধ দিয়েছি। ওদের মা-বোনদের জন্য কাপড়-চোপড় দিয়েছি।

মিথ্যে কথা। তুমি শ্রমিকদের উপর যে অত্যাচার অনাচার করেছো সব আমার জানা হয়ে গেছে। শ্রমিকদের মা-বোনদের ধরে এনে তুমি তাদের ইজ্জত নষ্ট করেছো......

মিথ্যা। সব মিথ্যা, আমি সবাইকে মা-বোনের মতই মনে করেছি।

সুরাইয়া এবার দাঁতে দাঁত পিষে বললো—সাধু বাবাজীর শিষ্য কে ছিলো জানো? সে হলো—আমি।

তুমি, তুমি......

হাঁ আমি সর্বক্ষণ তোমার পাশে থেকে সব দেখেছি, লক্ষ্য করেছি।

তুমি গোপনে...

গোপনে নয় সাক্ষাতে। পাশে থেকে সব দেখেছি। তুমি মানুষ নামে কুকুর......

সর্দার খাঁ গর্জন করে উঠলো—কি এতো বড় সাহস তোমার। আমাকে তুমি কুকুর বললে? শোন সুরাইয়া আমি জানি তুমি এই যুবককে ভালবাসো এবং সে কারণে তুমি এর মুক্তির জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছো। কিন্তু মনে

রেখো এর মুক্তি নেই। একে তোমার সম্মুখে তিল তিল করে হত্যা করা হবে!

সর্দার খাঁ কথা গুলো বলে পুনরায় প্রহরীকে ইংগিত করলো বনহুরের দেহে আঘাত করতে।

সপাং করে চাবুক এসে পড়লো বনহুরের শরীরে। যন্ত্রণায় বনহুর মুখ খানা কঠিন করলো তবু কোন শব্দ সে উচ্চারণ করলো না।

সুরাইয়া দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেললো।

সর্দার খাঁ পুনরায় বললো—বলো একে তুমি ভুলে যাবে? বলো জবাব দাও?

না ও আমার জীবন রক্ষা করেছে ওকে আমি কোন সময় ভুলতে পারবোনা। আমার জীবন দিয়ে ওকে আমি বাঁচাবো।

সর্দার খাঁ গর্জন করে উঠলো—তোমার জীবন দিয়েও তুমি একে বাঁচাতে পারবে না সুরাইয়া। তার প্রমাণ তুমি এক্ষুণি পাবে। প্রহরী এই মুহূর্তে তুমি একে ছোরা বিদ্ধ করে হত্যা করো।

প্রহরী হাতের চাবুক রেখে ছোরা তুলে নিলো হাতে।

সুতীক্ষ্ণ ছোরা খানা উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করে উঠলো।

বনহুর স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মরতে তার এতোটুকু ভয় নেই কিন্তু ভয় তার নাসিমার জন্য। বেচারী সেই নির্জন গুহায় একা একা তিল তিল করে শুকিয়ে মরবে।

সর্দার খাঁর দিকে কঠিন ভঙ্গীমায় তাকায় সুরাইয়া। দু'চোখে তার বিষ ছড়িয়ে পড়ে।

ওদিকে ছোরা হাতে ভীষণকায় প্রহরী পা পা করে এগিয়ে যাচ্ছে বনহুরের দিকে।

বনহুর নির্বাক নিস্পন্দ মুখো ভাব তার কঠিন অথচ দীপ্তময়। ঘাতক যতই অগ্রসর হচ্ছে ততই বনহুরের মুখ দৃঢ় হয়ে উঠছে। মৃত্যুর জন্য বনহুর প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে।

একেবারে নিকটে পৌছে গেছে ঘাতক।

দক্ষিণ হাতে তার সুতীক্ষ্ণ ছোরা। জমকালো চেহারা, যেন একটা পাথরের মূর্তি।

ছোরাখানা ঘাতক যেমন উদ্যত করে বনহুরের বুকে বসিয়ে দিতে যায় অমনি সুরাইয়া প্রহরীদের হাত থেকে নিজকে মুক্ত করে নিয়ে ঘাতকের সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে ছোরাখানা বিদ্ধ হয় সুরাইয়ার বুকে।

মূলহীন বৃক্ষের মত দুলতে থাকে সুরাইয়ার দেহটা।

বনহুর অধর দংশন করে, হাত দু'খানা তার লৌহ শিকলে বাঁধা থাকায় কোন কিছুই করতে পারেনা সে।

ছিন্ন লতার মত বনহুরের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ে সুরাইয়ার প্রাণহীন দেহটা। রক্তে সিক্ত হয়ে উঠে—কারাগার কক্ষের মেঝে।

সর্দার খাঁ অট্টহাসি হেসে উঠলো, তারপর বললো—কি পারলে সুরাইয়া নিজের জীবন দিয়ে ঐ বিদ্রোহী শ্রমিককে বাঁচাতে পারলে? ঘাতক এবার তুমি ওকে হত্যা করো।

ঘাতক ছোরাখানা সুরাইয়ার বুক থেকে একটানে তুলে নিলো। ফিনকী দিয়ে রক্ত ছুটলো। সে এক নির্মম করুণ দৃশ্য। দু'হাত দু'পাশে টান করে বাঁধা, বলিষ্ঠ কঠিন এক দেব মূর্তির পদ তলে যেন এক দেবী মূর্তির ছিন্ন দেহ।

ঘাতক ছোরাখানা তুলে নিয়ে যেমন বনহুরের বুকে বসিয়ে দিতে গেলো অমনি ঘাতকের পিঠে এসে বিদ্ধ হলো একটি গুলি। সঙ্গে সঙ্গে ঘাতক তীব্র আর্তনাদ করে হুমড়ি খেয়ে লুটিয়ে পড়লো সুরাইয়ার মৃত দেহের পাশে।

ক্ষিপ্তের ন্যায় সর্দার খাঁ ফিরে তাকালো দরজার দিকে। তার দল বল যারা সেই কক্ষে ছিলো তারাও ফিরে তাকিয়ে হক চকিয়ে গেলো। অবাক হয়ে দেখলো দরজার চৌকাঠে পা রেখে দাঁড়িয়ে আছে বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার। চোখে মুখে তার ভয়ঙ্কর হিংস্র ভাব ফুটে উঠেছে। দক্ষিণ হস্তে উদ্যত রাইফেল।

সর্দার খাঁ এবং তার দলবল মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো— তার পরক্ষণেই নিহত ঘাতকের হাত থেকে ছোরাখানা তুলে নিতে গেলো সর্দার খাঁ কিন্তু সে সুযোগ সর্দার খাঁ পেলেন না। বৃদ্ধ শ্রমিকের গুলি তার দক্ষিণ হাতে এসে বিদ্ধ হলো।

সর্দার খাঁর হাতখানা ঝুলে পড়লো, মুহূর্তে সে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, হুকুম দিলো তার দলবলকে বৃদ্ধ শ্রমিককে পাকড়াও করো।

কিন্তু কেউ অগ্রসর হতে সাহসী হলোনা।

বৃদ্ধ শ্রমিকের রাইফেল পুনরায গর্জে উঠলো, অমনি লুটিয়ে পড়লো সর্দার খাঁর প্রধান অনুচর আহম্মদ খাঁ। পরক্ষণেই আর একজন। তারপর আর একজন এমনি করে সর্দার খাঁর কয়েকজন অনুচরই ধরাশায়ী হলো।

সর্দার খাঁর ডান হাত ঝুলছে। বাম হাতে সে আবার তুলে নিলো ছোরাখানা।

ততক্ষণে বৃদ্ধ শ্রমিক আরও নিকটে সরে এসে দাঁড়িয়েছে। ছোরাখানা সর্দার খাঁ হাতে তুলে নিয়ে অগ্রসর হতেই বৃদ্ধ শ্রমিকের রাইফেল গর্জে উঠলো।

সঙ্গে সঙ্গে সর্দার খাঁ সরে দাঁড়ালো।

বৃদ্ধ শ্রমিকের গুলি গিয়ে বিদ্ধ হলো ওপাশের দেয়ালে।

সর্দার খাঁ মুহূর্ত বিলম্ব না করে মেঝের এক পাশে পা দিয়ে চাপ দিলো সঙ্গে সঙ্গে একটি সুরঙ্গ পথ বেরিয়ে এলো, সর্দার খাঁ সেই সুরঙ্গ পথে অদৃশ্য হলো।

বৃদ্ধ শ্রমিক সেই দন্ডে নীচে পড়ে থাকা একটা লোহার রড তুলে নিয়ে বনহুরের হাতের শিকলে আঘাত করলো। একটি হাত মুক্ত হলো বনহুরের।

বনহুরের একটি হাত মুক্ত হতেই সে নিজে অপর হাতখানা মুক্ত করে নেয়। তারপর বৃদ্ধ শ্রমিকের হাত থেকে দ্রুত রাইফেল খানা নিয়ে যে স্থানে সর্দার খাঁ পা দিয়ে চাপ দিয়েছিলো সেই জায়গায় পা দিয়ে চাপ দেয়। তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে আসে একটি সুরঙ্গ পথ।:

বনহুর সেই পথে নীচে নেমে যায়।

এক সঙ্গে তিন চারটে করে সিড়ির ধাপ অতিক্রম করে বনহুর অগ্রসর হয়। দক্ষিণ হাতে তার উদ্যত রাইফেল। চোখে মুখে প্রতিহিংসার ছাপ ফুটে উঠেছে। সর্দার খাঁকে তার চাই।

বেশ কিছুদূর অগ্রসর হতেই নজরে পড়লো সর্দার খাঁ দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে।

বনহুর তার গতি আরও দ্রুত করে সর্দার খাঁর সম্মুখে এসে পথ রোধ করে দাঁড়ালো।

মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়ালো সর্দার খাঁ। পরক্ষণেই সে ঝাঁপিয়ে পড়লো বনহুরের উপর।

বনহুর রাইফেল ছুড়ে ফেলে দিয়ে চালালো প্রচন্ড ঘুষি। সর্দার খাঁ ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেলো। কিন্তু পরেই উঠে সে আবার আক্রমণ করলো বনহুরকে।

বনহুর এবার সর্দার খাঁর গলার কাছে জামাটা এটে ধরে চোয়ালে লাগালো একটা ঘুষি। সঙ্গে সঙ্গে সর্দার খাঁর দাঁত ও নাক দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এলো।

মাতালের মত টলতে লাগলো সর্দার খাঁ।

বার বার সে হাতের পিঠে নাকের মুখের রক্ত মুছে নিচ্ছে। অল্পক্ষণেই সর্দার খাঁ সামলে নিলো তারপর সে পালাতে গেলো।

বনহুর ওকে পালাবার সুযোগ দিলোনা। ধরে ফেললো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো—কোথায় যাচ্ছো? তোমার কর্মের উপযুক্ত সাজা নিয়ে যাও।

সর্দার খাঁ স্থির হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলো কিন্তু সে পারছে না। তার দক্ষিণ হাত খানা শ্রমিক সর্দারের গুলির আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। অত্যন্ত রক্ত পাত হচ্ছে হাতখানা দিয়ে।

সর্দার খাঁর অবস্থা একেবারে শোচনীয় হয়ে উঠেছে।

বনহুর দাঁতে দাঁত পিষে বললো—শয়তান তুমি শুধু পাপ কাজই করোনি, তুমি তোমার প্রিয়তমা পত্নীকে একবার নয় দুবার হত্যা করেছো। তোমাকে হত্যা করে তোমার সব শাস্তি শেষ করে দিতে চাইনা। তোমাকে আমি জীবিত কবর দেবো, যেখানে বসে তুমি নিজের কর্মফলের কথা চিন্তা করতে সময় পাবে।

বনহুর সর্দার খাঁর গোপন কারাগারের একটি অন্ধকূপের সন্ধান জানতো। এবার সে সর্দার খাঁকে সেই কারাগারে নিয়ে আসে।

নির্জন কারাগারের মধ্যে অন্ধকূপ, সে এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাময় স্থান। এখানে সর্দার খাঁ বহু জীবন বিনষ্ট করেছে। যে বন্দীদের প্রতি তার বেশি আক্রোশ তাকে এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করে হত্যা করে। এখানে সহজে মৃত্যু হয়না। অন্ধকূপের মধ্যে দিনের পর দিন ক্ষুধা পিপাসায় তিল তিল করে শুকিয়ে মরে যায়।

বনহুরকেও সাজা দেবার পর এই অন্ধকূপে নিক্ষেপ করার কথা ছিলো। সেই সাজা এবার বনহুর দিতে চলেছে সর্দার খাঁকে।

ভয় কাতর চোখে সর্দার খাঁ তাকালো বনহুরের দিকে।

বনহুর তখন সর্দার খাঁকে প্রচন্ড এক ধাক্কায় অনূকূপে নিক্ষেপ করলো।

একটা তীব্র আর্তনাদ ভেসে এলো অন্ধকূপের ভিতর থেকে।

ফিরে এলো বনহুর বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দারের পাশে।

বৃদ্ধ শ্রমিক তখন সুরাইয়ার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে রোদন করছিলো।

বনহুর এসে বৃদ্ধ শ্রমিকের কাঁধে হাত রাখে।

বৃদ্ধ শ্রমিক চোখ তুলে তাকায়।

বনহুরের চোখ দু'টোও ঝাপসা হয়ে আসছিলো। সুরাইয়া নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে তার জীবন রক্ষা করেছে। সর্দার খাঁর ছোরা তার বুকে বিদ্ধ হলে এতোক্ষণ তার দেহটা লৌহ শিকলে ঝুলতো। বনহুর সুরাইয়ার মুখখানা তার শাড়ীর আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়ে বলে—একে ঘুমাতে দাও বাবা। একটু শান্তিতে ঘুমাতে দাও—

বৃদ্ধ শ্রমিক সুরাইয়ার মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে রেখে উঠে দাঁড়িয়ে আতঙ্কিত কণ্ঠে বলে—সর্দার খাঁ সাহেব কোথায়? তিনি এসে পড়বেন, চলো পালিয়ে যাই।

বনহুর গম্ভীর শান্ত গলায় বললো—সর্দার খাঁ আর আসবেনা। তার অন্ধকূপে সে বিশ্রাম করছে। সর্দার বাবা এবার তোমরা নিশ্চিন্ত।

বৃদ্ধ শ্রমিক সর্দার বনহুরকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

তাদের আশে-পাশে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে আছে অনেক গুলো মৃতদেহ।

তাদের পায়ের কাছে সুরাইয়া যেন চির নিদ্রায় অচেতন।

গুহায় ফিরে এলো বনহুর।

সমস্ত জামা-কাপড় তার ছিন্ন ভিন্ন। জামার ছেঁড়া অংশ দিয়ে শরীরের স্থানে স্থানে দেখা যাচ্ছিলো, সেই জায়গা জায়গায় কেটে রক্ত জমাট বেঁধে আছে।

বনহুর গুহা মধ্যে প্রবেশ করতেই নাসিমা ব্যস্ত ভাবে ছুটে আসে। বনহুরের চেহারা দেখে সে একেবারে হতভম্ব হয়ে যায়। প্রথমেই সে দু'হাতে বনহুরের হাত দু'খানা ধরে ফেলে তারপর ব্যাকুল কণ্ঠে বলে—হাসান ভাই, একি হয়েছেন আপনি?

বনহুর গা থেকে ছিন্ন ভিন্ন জামাটা খুলে ফেলে বলে—ও কিছু না বোন।

একি হয়েছে? সমস্ত শরীরে এ কিসের দাগ? বলুন—বলুন হাসান ভাই?

চাবুকের আঘাত?

হাঁ!

কি করে এমন হলো?

নিজেকে সর্দার খাঁর কাছে সমর্পন করেছিলাম। তাই তারা আমার দেহের উপর নির্যাতন চালিয়েছিলো...—

উঃ কি নির্মম পাষন্ড ওরা। নাসিমা বনহুরের শরীরে তার কোমল হাতখানা বুলিয়ে দেয়।

বনহুর একটু হেসে বলে—এটা এমন কিছু হয়নি নাসিমা। দু'দিনেই সেরে যাবে।

নাসিমার মুখোভাব ব্যথা করুণ হয়ে উঠে। ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ে তার চোখ থেকে। একটু পরে বলে নাসিমা—হাসান ভাই যাদের জন্য আপনি নিজকে এমনভাবে নির্যাতিত করলেন, সেই বন্দী শ্রমিকদের মুখে কি খাবার তুলে দিতে পেরেছিলেন?

হাঁ পেরেছিলাম। শুধু তাই নয় সমস্ত বন্দী শ্রমিকদের আমি মুক্ত করে তাদের কলোনীতে ফিরিয়ে এনেছি। এখন সবাই স্বাধীন মুক্ত আর তাদের উপর সর্দার খাঁ নির্যাতন চালাতে পারবে না.....

বনহুরের কথায় আনন্দ উচ্ছ্বল হয়ে উঠে নাসিমা, বলে সে—সত্যি হাসান ভাই আপনার বাসনা পূর্ণ হয়েছে? আপনাদের দুঃস্থ শ্রমিক বন্ধুদের মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছেন?

হাঁ বোন আমার বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

কিন্তু সর্দার খাঁ যদি জানতে পারে তাহলে সে আবার আপনার উপর নির্যাতন চালাবেন।

সে আর কোন দিন আমাকে পাকড়াও করতে আসবে না নাসিমা। সর্দার খাঁ তার নিজের নির্জন কারাগারের অন্ধকূপে চির বিশ্রাম করছে।

সত্যি! সত্যি হাসান ভাই?

হাঁ নাসিমা।

নাসিমার মুখে একটা দীপ্ত খুশী ভরা ভাব ফুটে উঠলো। যত ভয় ছিলো তার সর্দার খাঁকে। এই শয়তান তার হাসান ভাইকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছিলো।

বললো নাসিমা—হাসান ভাই এবার তাহলে আমরা নিশ্চিন্ত?

হাঁ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। নাসিমা সর্দার খাঁর অত্যাচার থেকে ফাংহার নিরীহ শ্রমিকদের বাঁচানোর জন্য আমি শপথ গ্রহণ করেছিলাম—আমার শপথ রক্ষা

হয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখ যার সহায়তায় আমি আমার শপথ রক্ষা করতে সমর্থ হলাম তাকে রক্ষা করতে পালাম না।

নাসিমার মনে বিরাট একটা প্রশ্ন জাগলো। ব্যাকুল কণ্ঠে বললো— হাসান ভাই, বোন সুরাইয়া কোথায়? সে কেমন আছে?

বনহুরের চোখে মুখে একটা ব্যথা করুন ভাব ফুটে উঠলো, অধর দংশন করলো সে কোন জবাব দিলো না নাসিমার প্রশ্নের। একটা উচু পাথরের উপরে বসে নিজের আংগুলগুলো দিয়ে চুলগুলো টানতে লাগলো।

নাসিমা বুঝতে পারলো এমন কিছু একটা ঘটেছে যা ভাষায় বর্ণনা করতে পারছে না বনহুর। ওর মুখোমন্ডলে একটা দারুন গাম্ভীর্যের ছাপ ফুটে উঠলো।

নাসিমা ব্যাকুল আঁখি মেলে তাকিয়ে আছে। এগিয়ে আসে সে বনহুরের আরও কাছে। ওর চুলে নিজের হাত রেখে বলে—বুঝতে পেরেছি সুরাইয়ার কোন অঘটন ঘটেছে।

এবার বনহুর বলে—সুরাইয়া নিজের জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছে নাসিমা। ও সে কি ভয়ঙ্কর নির্মম দৃশ্য।

সুরাইয়া বেঁচে নেই?

না।

তাকে কে হত্যা করলো হাসান ভাই?

তার স্বামী।

উঃ কি সাংঘাতিক।

সত্যি বড় নির্মম নাসিমা।

কি করে তার এ অবস্থা হলো হাসান ভাই?

একটু পানি দাও নাসিমা, পানি পান করে তোমার কাছে সব বলবো।

হাঁ তাই ভাল। নাসিমা তাড়াতাড়ি এক গেলাস পানি এনে বনহুরের সম্মুখে দাঁড়ায়।

বনহুর হাত বাড়ায় গেলাসটা নাসিমার হাত থেকে নেবার জন্য।

কিন্তু নাসিমা পানির গেলাস বনহুরের হাতে দেয়না। সে নিজেই গেলাসটা তুলে ধরে বনহুরের মুখে—খেয়ে নিন।

বনহুর পানি পান করে।

নাসিমা বলে— আপনি বড় ক্লান্ত বিশ্রাম করুন।

বিশ্রাম! একটু হাসলো বনহুর তার মনের পর্দায় ভেসে উঠলো মনিরার মুখ, সে বলতো তোমার জীবনে কি বিশ্রাম নেই? একটু বিশ্রাম করবেনা তুমি? বনহুর বলতো—বিশ্রাম আমার জন্য নয় মনিরা......অস্ফুট কণ্ঠে বলে বনহুর—বিশ্রামের সময় কই নাসিমা? আর কতদিন তোমাকে এভাবে কষ্ট দেবো বলো?

হাসে নাসিমা—কষ্ট আমার? কি যে বলেন হাসান ভাই? কষ্ট আমার কিচ্ছু হচ্ছে না। যত কষ্ট দুঃখ বলো সে তো আপনি নিজের উপর চাপিয়ে নিয়েছেন।

এই যে নির্জন গুহায় একা একা কত খারাপ লাগে তোমার নাসিমা?

মোটেই না। একা একা বড় ভাল লাগে।

সত্যি বলছো নাসিমা?

হাঁ, হাসান ভাই।

আশ্চর্য মেয়ে তুমি।

আশ্চর্য মানুষের সঙ্গে থেকে আমিও......

আশ্চর্য মেয়ে হয়ে গেছো এইতো?

হাসান ভাই এই নির্জন গুহা আমার কাছে প্রিয়। সারাদিন পর আপনি যখন আসেন তখন আমার সব ব্যথা ভুলে যাই। তাইতো আমি প্রতিক্ষা করি কখন ফিরবেন আপনি— —

নাসিমা!

হাঁ, সারাটা জীবন আমি এই নির্জন গুহায় একা কাটিয়ে দিতে পারবো যদি আপনি থাকেন আমার পাশে। আপনি হয়তো কিছু মনে করছেন হাসান ভাই কিন্তু আমার মনে কোন পাপ বাসনা নেই। আপনি আমায় যেমন ছোট বোনের মত স্নেহ করেন আমিও তেমনি আপনাকে বড় ভাই বলেই মনে করি তবু......তবু আপনি আমার স্বপ্ন ধ্যান ধারণা সব কিছু— —

নাসিমা!

এবার বনহুরের কণ্ঠ গম্ভীর।

নাসিমা বনহুরের গম্ভীর কণ্ঠে চমকে চোখ তুলে তাকায়।

বনহুর বলে—নাসিমা আমাকে সম্পূর্ণ ভুলে যাও। কারণ ফাংহায় কাজ শেষ হয়েছে এবার আমি তোমাকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিয়ে ফিরে যাবো আমার আস্তানায়! হাঁ, শোন সুরাইয়ার কাহিনী। তার স্বামী যখন আমার দু'হাত দু'পাশে বেঁধে চাবুকের আঘাতে আমাকে জর্জরিত করছিলো তখন

সুরাইয়া সেই জায়গায় এসে পড়ে এবং তার স্বামী সর্দার খাঁর কাজে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু সর্দার খাঁ তখন আমাকে ছোরাবিদ্ধ করে হত্যা করতে যায় ঐ মুহূর্তে সুরাইয়া ছুটে এসে ছোরার নীচে বুক পেতে দেয়। জানো নাসিমা সুরাইয়া কত বড় ভুল করেছে?

ভুল! না না সে ভুল করেনি হাসান ভাই! সে যদি নিজে বুক পেতে না দিতো তাহলে কি হতো বলোতো? একটা মহামূল্য প্রাণ প্রদীপ নিভে যেতো— —

অট্টহাসি হেসে উঠলো বনহুর।

নাসিমা অবাক হয়ে গেলো, সে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো বনহুরের মুখের দিকে।

বনহুর হাসি থামিয়ে বললো—আর যে প্রাণ প্রদীপটা নিভে গেলো সেটি মহামূল্য নয়?

নাসিমা নীরব।

বনহুর বললো—নীরব থেকোনা জবাব দাও নাসিমা? একটু থেমে বললো বনহুর—আমাদের দেশে সবচেয়ে একটি বড় কুসংস্কার আছে যেটি হলো আমাদের নারী সমাজে মেয়েদেরকে সব সময় অবহেলার চোখে দেখা হয় এবং সে কারণে প্রতিটি মেয়ে মনে করে মেয়েদের জীবনের কোন দাম নেই। শুধু পুরুষদের জীবনই মহামূল্যবান—নাসিমা আমি মনে করি আমার জীবনের চেয়ে সুরাইয়ার জীবন কোন অংশে কম ছিলো না। তার জীবনেও ছিলো অনেক আশা-আকাঙ্খা। ছিলো বেঁচে থেকে ঘর সংসার করার বাসনা। কিন্তু সে তা হতে দিলোনা—নাসিমা, আমার কাছে নারী পুরুষ একই সমান। কাজেই তোমার জীবনের চেয়ে আমার জীবন মোটেই মূল্যবান নয়।

এবার নাসিমা কথা বললো—বেশ তাই হবে। এখন আপনি চুপ করে একটু বিশ্রাম করুন। আমি আপনার শরীরে ঔষধ লাগিয়ে দেই?

ঔষধ! ঔষধ কোথায় পেলে নাসিমা?

বেশ কিছুদিন আগে আপনি আমার জন্য একটা মলম এনে দিয়েছিলেন।

ও সেই ব্যথার ঔষধটা?

হাঁ।

বনহুর হাতের উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়ে!

নাসিমা বলে—হাসান ভাই আপনি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমান।

কতক্ষণ তুমি বসে বসে কাটাবে নাসিমা?

যতক্ষণ আপনি ঘুমান।

তা হয়না, তুমি রবং— —

না না আপনি আমার কোলে মাথা রেখে ঘুমান।

বনহুর নাসিমার কথা ফেলতে পারেনা; সে ওর কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে।

নাসিমা ধীরে ধীরে বনহুরের চুলে হাত বুলিয়ে দেয়।

অল্পক্ষণেই ঘুমিয়ে পড়ে বনহুর।

নাসিমা বনহুরের ঘুমন্ত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। নির্বাক নির্নিমেশ নয়নে।

হঠাৎ এক সময় ঘুম ভেংগে যায় বনহুরের। অবাক হয় নাসিমা তখনও তার মাথাটা কোলে করে বসে আছে। বনহুর চোখ মেলে বলে, একি তুমি এখনও বসে আছো নাসিমা?

নাসিমা কোন জবাব দেয় না।

বনহুর উঠে বসে বলে—নাসিমা তুমি বড্ড জেদী মেয়ে। কে বলেছিলো তোমাকে এমন করে জেগে বসে থাকতে?

আমার মন!

ও তোমার মন দেখছি বড় খেয়ালী। নাও এবার তুমি শুয়ে পড়ো দেখি।

কিন্তু ঘুম আমার আসবেনা!

কেনো?

জানিনা।

ও ভয় পাচ্ছো?

ভয়! হাসান ভাই আপনি থাকতে আমার কোন ভয় নেই।

তবে?

আপনার কত কষ্ট হচ্ছে।

কষ্ট! না ও কিছুনা নাসিমা।

সমস্ত দেহে আঘাতের ক্ষত অথচ বলছেন কষ্ট হচ্ছে না।

নাসিমা দেহের ক্ষতের চেয়ে আমার মনের ক্ষত অনেক বড়, অনেক কষ্টকর। যতক্ষণ না তোমাকে তোমার বাবার কাছে পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছি ততক্ষণ আমার মন কষ্ট দূর হবে না। কারণ আজও সর্বক্ষণ তোমার

বাবার সেই কণ্ঠস্বর আমার কানের কাছে বাজছে। নাসিমা তোমার আব্বা বলেছিলেন, আমার মাকে আপনি রক্ষা করবেন। আমার মায়ের ইজ্জত আপনি রক্ষা করবেন—তার কথাগুলো আমি ভুলিনি ভুলবোনা—নাসিমা। একটু থেমে আবার বললো বনহুর—তুমি প্রস্তুত হয়ে নাও কাল সন্ধ্যায় আমরা রওয়ানা দেবো——

তা হয় না হাসান ভাই।

কেনো হয় না?

আপনি বড় অসুস্থ। আপনি না বললেও আমি বুঝতে পারছি এখন আপনার কোথাও যাওয়া উচিৎ নয়।

তুমি জানো না নাসিমা আমার শরীর বেশ সুস্থ আছে।

তবু আমার অনুরোধ আর দুটো দিন আপনি বিশ্রাম করবেন।

বেশ তোমার কথা আমি রাখলাম।

দু'দিনে অনেক সুস্থ হয়ে উঠলো বনহুর। তার শরীরের দাগগুলো ধীরে ধীরে মিশে এলো। রোজ নাসিমা নিজে বনহুরের শরীরে ঔষধ লাগিয়ে দিতো। সেবা যত্ন করতো সে সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে।

অন্যান্য দিনের মত আজও নাসিমা বনহুরের পাশে এসে দাঁড়ালো, হাতে তার ঔষধের শিশি।

বনহুর হেসে বললো—লক্ষ্মী বোনটি আজ আমাকে ক্ষমা করো, কারণ আমার শরীর এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

নাসিমা গম্ভীর হয়ে বলে—আমি জানি আপনার শরীর কেমন হয়েছে। নিন জামা খুলুন হাসান ভাই।

তবু আমাকে......

হাঁ জ্বালাবো।

নাসিমা তোমার এ সেবা যত্নের কথা আমি ভুলবো কি করে বলো? চিরদিন তোমার এ দানের কথা মনে থাকবে।

আপনি আমার জন্য কত করেছেন তার প্রতিদানে আমি কতটুকুই বা করলাম। জামা খুলুন।

বনহুর বাধ্য ছেলের মত নিজের শরীর থেকে জামাটা খুলে ফেললো।

নাসিমা শিশি থেকে ঔষধ নিয়ে ধীরে ধীরে বনহুরের শরীরে মালিশ করে দিলো।

বনহুর বললো—আজ রাতটা আমাদের এ গুহায় শেষ রাত নাসিমা।

হাঁ।

কাল আমরা বাংলাদেশ অভিমুখে রওয়ানা দেবো।

জানি।

নাসিমা!

বলুন?

তোমাকে পুরুষ সাজতে হবে, পারবে তো?

পারবো।

পোশাক আমি এনে রেখেছি নাসিমা—কোন অসুবিধা হবে না।

আমি দেখেছি।

হেসে বলে বনহুর—আমি কিন্তু তোমাকে কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

কেনো?

হয়তো তুমি রাজি হবে না ভেবে বলতে...

সাহসী হননি কেমন?

হাঁ।

নাসিমা যাবার আগে আর একবার শ্রমিক কলোনীতে যাবো। শ্রমিক বন্ধুদের সঙ্গে শেষ দেখা করতে......

আমিও যাবো হাসান ভাই আপনার সঙ্গে।

আচ্ছা যেও।

❑

ফাংহার কাজ শেষ করে বনহুর নাসিমাসহ বাংলাদেশ অভিমুখে রওয়ানা দেয়। নাসিমাকে বনহুর সম্পূর্ণ পুরুষের ড্রেসে সজ্জিত করে নিয়েছে, তাকে দেখে কেউ নারী বলে মনে করবে না।

বনহুর আর নাসিমা পাশাপাশি দুটো আসনে বসে আছে। প্লেনখানা তখন ফাংহা ত্যাগ করে কোয়েটার উপর দিয়ে সাপশা বন্দর অভিমুখে উড়ে চলেছে।

নাসিমার মুখোভাব খুব গম্ভীর।

কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তারা সাপশা বন্দরে পৌছে যাচ্ছে। তারপর সাপশা থেকে সোজা বোম্বে। বোম্বে থেকে বাংলাদেশ। তাকে বাংলাদেশে

পৌঁছে দিয়েই ফিরে যাবে হাসান ভাই তার গন্তব্যস্থানে। আর কোন দিন ওর দেখা পাবে না। তাদের মধ্যে যে একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তাও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে।

বনহুর আপন মনে একটা পত্রিকায় দৃষ্টি বুলিয়ে চলেছিলো। হঠাৎ তার নজর চলে গেলো ও পাশের একটি লোকের উপর। লোকটার মনোভাব মোটেই ভাল নয় বুঝতে পারে বনহুর। নিশ্চয়ই সে কোন কু'মতলব নিয়ে এই বিমানে উঠেছে।

বনহুর যা ভাবছে অবশ্য তা ভুল নয়।

লোকটা ফাংহার বিমান দস্যু হীরুসেন। সে এই বিমানখানাকে সাপশা না অবতরণ করতে দিয়ে খংরুতে অবতরণ করাবে এবং যার কাছে যা আছে কেড়ে নিয়ে সে উধাও হবে। হীরুসেন তার দু'জন সঙ্গীকে ইংগিত করলো কিছু।

বনহুর লক্ষ্য করছে।

নাসিমা কিন্তু আনমনে তাকিয়ে আছে বাইরের আকাশের দিকে।

হীরুসেনের দুই সঙ্গী উঠে দাঁড়ালো।

হীরুসেন অগ্রসর হচ্ছে প্লেনের সম্মুখ ভাগের দিকে, তার সঙ্গীদ্বয় তার পিছনে কিছুদূর এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। সঙ্গীদ্বয় পকেটে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে।

বনহুর পত্রিকাখানা ভাঁজ করে পাশে রাখলো।

হীরুসেন তখন বিমান চালকের পিছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয় প্রস্তুত হয়ে আছে যে মুহূর্তে তারা হীরুসেনের ইংগিত পাবে সেই মুহূর্তে তারা রিভলভার বের করে যাত্রীদের উপর লক্ষ্য স্থির করবে যাতে কোন যাত্রী নড়াচড়া করতে না পারে।

বনহুর পত্রিকাখানা রেখে বাথরুমে প্রবেশ করলো।

হীরুসেন ততক্ষণে বিমান চালকের পিঠে রিভলভার চেপে ধরেছে।

সঙ্গে সঙ্গে হীরুসেন তার সঙ্গীদ্বয়কে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াবার জন্য ইংগিত করলো।

সঙ্গীদ্বয় প্যান্টের পকেট থেকে রিভলভার বের করে যাত্রীদের দিকে উঁচু করে ধরলো এবং কঠিন কণ্ঠে বললো—খবরদার আপনারা কেউ নড়বেন না। একটু নড়লেই আমরা গুলি চালাবো।

যাত্রীরা এমন একটা অবস্থার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলো না। তারা হক চকিয়ে যায়, সবাই এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ী করে।

নাসিমার নজরও এসে পড়ে এই দুই দস্যুর উপর। সে পাশে তাকিয়ে দেখে বনহুর নেই। মুখমন্ডলে তার চিন্তার ছাপ ফুটে উঠে। তাকায় এদিক ওদিক। হঠাৎ সে গেলো কোথায়।

বনহুর অতি লঘু পদক্ষেপে উঠে বাথরুমে প্রবেশ করেছিলো তাই নাসিমা বুঝতেই পারেনি সে গেলো কোথায়। কেমন যেন একটা ভীত ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ততক্ষণে হীরুসেন গম্ভীর দৃঢ় গলায় বিমান চালককে লক্ষ্য করে বলে উঠে—বিমান সাপশায় অবতরণ করবে না। বিমান অবতরণ করবে খংরুতে। আমি বিমানের ওয়্যারলেস মেসিন নষ্ট করে দিয়েছি কাজেই কোন রকম চালাকী চলবে না।

পাইলট নিরুপায়।

তার পাঁজরে রিভলভারের আগা ঠেকে রয়েছে। সে একটি টু শব্দ করতে সক্ষম হলো না।

যাত্রীরাও নীরব।

সকলের মুখে একটা ভীতি ভাব ফুটে উঠেছে।

বনহুর বাথ রুমের দরজায় দাঁড়িয়ে একটি সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করে। মুখমন্ডলে তেমন কোন চিন্তার ছাপ নেই। কয়েক মুখ ধুয়া ছুড়ে দিয়ে সিগারেটটা বিমানের মেঝেতে নিক্ষেপ করে জুতো দিয়ে পিষে নিভিয়ে ফেলে। ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সে বিমান চালকের পিছনে দাঁড়ানো হীরুসেনের পাশে।

তখন বিমানের মধ্যে এমন একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিলো যার জন্য কেউ বনহুরকে খেয়াল করেনি। এমন কি হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয়ও তখন বিমান যাত্রীদের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলো কারণ কেউ যেন একটু নড়া চড়া করতে না পারে।

বনহুর হীরুসেনের পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মুখভাব তার কঠিন।

হাত দু'খানা তার শূন্য, কোন অস্ত্র নেই বনহুরের হাতে।

নাসিমার দৃষ্টি কিন্তু সকলের অলক্ষ্যে বনহুরের দিকে চলে যায়। সে যে ওকেই অন্বেষণ করে ফিরছিলো। মুহূর্তে ফ্যাকাশে হয়ে উঠে নাসিমার মুখ।

বনহুর নিরস্ত্র আর দস্যু হস্তে উদ্যত রিভলভার। শুধু দস্যু হস্তেই নয় তার দু'জন সাথীর হাতেও আগ্নেয় অস্ত্র। নাসিমার ভয় পাবার কথাই বটে।

হঠাৎ ফিরে তাকায় হীরুসেন। সঙ্গে সঙ্গে বনহুর ওর দক্ষিণ হাত থেকে এক ঝটকায় রিভলভার খানা কেড়ে নিয়ে ওর বুকে চেপে ধরে। তারপর হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে—খবরদার কেউ এগুবে না। তোমরা রিভলভার ফেলে দাও।

সঙ্গীদ্বয় হতবাক কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গেছে। তারা ভাবতেও পারেনি এমন একটা কিছু হবে বা ঘটবে। তারা জানে তাদের দলপতি হীরুসেনের মত দক্ষ দস্যু আর বুঝি কোথাও নেই।

বনহুর পুনরায় কঠিন ভাষায় হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয়কে লক্ষ্য করে বলে— যদি তোমাদের দলপতির মৃত্যু না চাও তবে তোমরা যার যার অস্ত্র বিমানের বাইরে নিক্ষেপ করো।

হীরুসেনের বুকে তখন বনহুরের হস্তস্থিত রিভলভারের আগা দেবে বসে আছে। হীরুসেনের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। সে নিজেও কেমন নির্বাক হয়ে গেছে। কারণ সে বহুদিন যাবত বিমান দস্যুতা করে আসছে কিন্তু এমন অবস্থায় সে কোন দিন পড়েনি।

বনহুরের দীপ্ত সুন্দর বলিষ্ঠ চেহারা এতোক্ষণে যেন সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তারা সবাই মনে প্রাণে সেই দয়াময় খোদাকে স্মরণ করছে।

বনহুর পাইলটকে নির্দেশ দিলেন বিমানের গতি বাড়িয়ে দিতে এবং সাপশা বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে।

পাইলট বনহুরের নির্দেশ মত কাজ করে চললো।

বনহুর যখন পাইলটকে নির্দেশ দিচ্ছিলো তখন হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয় বিমান থেকে লাফিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলো।

বনহুর যাত্রীদের আদেশ দিলো ওদের ধরে ফেলতে।

সঙ্গে সঙ্গে হীরুসেনের সঙ্গীদ্বয়কে পুরুষ যাত্রীগণ আটক করে ফেললো।

বনহুর সেই সময় একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। অমনি হীরুসেন প্রচন্ড এক থাবায় বনহুরের হাত থেকে রিভলভার খানা ফেলে দেয়। এবং সে নিজে প্যারাসুট নিয়ে নীচে লাফিয়ে পড়তে যায়।

বনহুর পিছন থেকে ওর জামার কলারের অংশ চেপে ধরে।

সঙ্গে সঙ্গে আহত ব্যাঘ্রের মত ফিরে দাঁড়ায় হীরুসেন এবং আক্রমণ করে বনহুরকে।

এবার শুরু হয় ধস্তাধস্তি।

বিমান তখন সাপশার আকাশে এসে পড়েছে। আর কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাদের বিমানখানা সাপশা বিমান বন্দরে অবতরণ করবে।

পাইলট বিমানের বিপদের কথা সাপশা বিমান পুলিশ বাহিনীকে জানায়। বিমানখানা বন্দরে পৌঁছবার পূর্বেই সাপশা পুলিশ বাহিনী বিমান বন্দরের প্লাট ফরম ঘিরে দাঁড়ায়।

বিমানখানা যখন একেবারে সাপশা বিমান বন্দরের আকাশে এসে পড়ে তখন হীরুসেন রীতিমত হাঁপিয়ে পড়েছে। বনহুর প্রচন্ড এক ঘুষিতে ধরাশায়ী করে ফেলে।

বিমানের মেঝেতে হীরুসেন চীৎ হয়ে পড়ে যায়।

বনহুর ওর বুকে দক্ষিণ পা তুলে দিয়ে দাঁড়ায়। একটু নড়তে পারেনা হীরুসেন।

তার অনুচরদ্বয় তখন যাত্রীদের কাছে বন্দী হয়ে পড়েছে। কারো মুখে কোন কথা বের হচ্ছেনা।

নাসিমার দু'চোখে বিস্ময়, সে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে বনহুরের দিকে।

বিমানখানা অল্পক্ষণের মধ্যেই সাপশা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। একদল পুলিশ বাহিনী বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলো। বিমান অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ বাহিনী বিমানখানাকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলে।

দস্যু হীরুসেন ও তার অনুচরদ্বয় বন্দী হয়।

সাপশার পুলিশ প্রধান বনহুরকে অভিনন্দন জানান। তার কৃতিত্বের কথা যাত্রীদের মুখে শুনে সবাই অবাক হয়ে যায়। কেমন কৌশলে এই তিন জন বিমান দস্যুকে বনহুর বন্দী করতে সক্ষম হয়েছে।

পুলিশ প্রধান বনহুরকে দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিতে চাইলেন। কারণ এই বিমান দস্যু হীরুসেনকে গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ মহল দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণ করেছিলেন।

বনহুর হেসে বললো—এ টাকা আপনারা সাপশার দুঃস্থ জনগণের মধ্যে বিতরণ করে দেবেন।

এমন মহৎ হৃদয় ব্যক্তি পুলিশ প্রধান এই প্রথম দেখলেন। দশ হাজার টাকা হাতে পেয়ে যে গ্রহণ না করে সে কেমন মানুষ।

এক সময় সাপশা বন্দর থেকে বিদায় নিলো বনহুরের বিমানখানা।

ওদিকে তখন দস্যু হীরুসেন ও তার সঙ্গীদ্বয়কে বন্দী করে পুলিশ ভ্যানে তুলে নেওয়া হয়েছে।

❑

নাসিমাকে তার পিতার কাছে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে বনহুর ফাংহায়। ফাংহায় অনেক দিন কাটিয়ে গিয়েছে, তাই কেমন যেন একটা মায়া বসে গেছে তার। ফাংহায় এসে আবার সে শ্রমিক কলোনীতে যায়, দেখা করে শ্রমিকদের সকলের সঙ্গে।

ফাংহায় শ্রমিকগণ বনহুরকে ঘিরে ধরে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ এখন তাদের উপর পূর্বের সেই অকথ্য নির্যাতন নেই। তারা কাজ করে, তার ন্যায্য দাম পায়।

বনহুরকে ওরা নানা ভাবে আদর-যত্ন করে।

নানা রকম খাবার তৈরি করে খাওয়ায়। শ্রমিক সর্দার জানতো বনহুর ফল ভালবাসে তাই প্রচুর ফল এনেছিলো, বনহুর ইচ্ছামত ফল খায়।

খুশী হয় শ্রমিকগণ।

আজ এত আনন্দের মধ্যে বার বার মনে পড়ে বনহুরের সেই একটি মুখ, নাসিমা আজ তার জন্য ফাংহা পর্বতের গুহায় প্রতীক্ষা করছে না। কেন যেন বনহুরের মনটা হাহাকার করে উঠে ওর জন্য। একটি বার ঐ গুহায় যাবার জন্য সে অস্থির হয়ে উঠে।

শ্রমিক কলোনী থেকে বিদায় নিয়ে বনহুর সেই নির্জন গুহায় এসে দাঁড়ায়। সমস্ত গুহাটা খাঁ খাঁ করছে, কেমন যেন একটা গভীর ব্যথা ভরা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে সেখানে। বনহুরের চোখের সম্মুখে ভেসে উঠে নাসিমার মুখ খানা। সেই কণ্ঠস্বর শুনতে পায়।

বনহুরের চোখে পানি এসে যায়, ভাবে বনহুর ওর কথা এতো মনে পড়ছে কেনো। তার জীবনে বহু নারী সে দেখেছে, তাকে ভালও বেসেছে অনেকে কিন্তু এমন করে কারো কথা তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে নি। নাসিমাকে সে প্রথম থেকেই বোনের মত দেখে এসেছে, বোনের মত

ভালবেসেছে, তাই বুঝি একটা পবিত্র ভালবাসা তার মনকে অস্থির করে তুলছে।

বেশিক্ষণ বনহুর এ গুহায় অপেক্ষা করতে পারে না। এবার সে ফিরে চলে তার সঙ্গী সাথী রহমান, কাওসার, রামসিং আর হারুন যেখানে সেই লাহোরে।

রহমান আর রামসিং সর্দারের জন্য অক্ষেপা করছিল। কাওসার হারুন এরা ফিরে গিয়েছে কান্দাই। অবশ্য রহমানই এদের পাঠিয়ে দিয়েছে কারণ সর্দার করে ফিরবে তাদের জানা ছিলোনা। কান্দাই আস্তানায় তাদের জন্য সবাই গভীর চিন্তায় অস্থির ছিলো। এ জন্যই রহমান তাদের পাঠিয়ে দিয়েছে। আজ হঠাৎ সর্দারকে সুস্থ ভাবে ফিরে আসতে দেখে রহমান ও রামসিং আনন্দে অধীর হয়ে উঠলো।

রহমান আর রামসিং অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিলো, কারণ সর্দারের এক সপ্তাহ কিংবা দু' সপ্তাহের মধ্যে ফিরে আসার কথা ছিলো।

যখন সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেটে চললো, ফিরে এলো না বনহুর তখন চিন্তিত না হয়ে কোন উপায় ছিলো না। ওরা যে সন্ধান নেবে তারও কোন ঠিকানা ছিলো না। কাজেই বাধ্য হয়ে তারা প্রতীক্ষা করছিলো সর্দারের। তারা জানতো তাদের সর্দার নিশ্চয়ই একদিন ফিরে আসবেনই।

সেই আস্তানা।

যেখানে একদিন বনহুর নাসিমাকে এনে রেখেছিলো প্রথম এক সময়।

এখানে পৌঁছেও বনহুর নাসিমার অভাব অনুভব করতে লাগলো। মনটা বড় ভাল লাগছে না তার।

রহমান আর রামসিং বনহুরকে পেয়ে অত্যন্ত খুশী হলো। তারা নানা ভাবে জানার চেষ্টা করলো সর্দার এতোদিন কোথায় ছিলেন, কি করলেন।

বনহুর বিশ্রাম করতে করতে সব কথা সংক্ষেপে রহমান ও রামসিংকে বললো।

সব শুনে বললো রহমান—সর্দার আমাদের কাজ এবার শেষ হয়েছে, আমরা আস্তানায় ফিরে যেতে চাই?

বনহুর জবাব দিলো —হাঁ আমিও তাই ভাবছি। কিন্তু একটা কাজ এখনও আমার বাকী আছে রহমান।

বলুন সর্দার!

শাম্মীর হাতের অংগুরী কোথায় আছে, আমাকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

রহমান মুখ গম্ভীর করে বললো—সর্দার অমন কত অংগুরী কোথায় হারিয়ে যায় কে তা খুঁজে পায়। একটা সামান্য.....

রহমান তুমি জানো না—এ অংগুরী সামান্য নয়। আমার আম্মার দেওয়া সেই অংগুরী আমি শাম্মীকে উপহার দিয়েছিলাম তার ভালবাসার প্রতিদানে। রহমান আমি জানি না এ অংগুরী কোথায় আছে কিন্তু আমাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

সর্দার আমার মনে হয় শাম্মীকে যে হত্যা দিয়েছিলো সেই এ অংগুরী কোথাও গোপন করে রেখেছে।

তোমার সন্দেহ মিথ্যা নয় রহমান। যতক্ষণ না আমি সেই অংগুরী উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছি, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত নই।

❑

গভীর রাত।

বনহুরের ঘুম ছুটে যায়।

কে যেন তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। নিশ্বাসের শব্দ কানে আসছে তার।

বনহুর চোখ মেলে তাকালো, অন্ধকারে ছায়ার মত কেউ যেন নজরে পড়লো তার। বনহুর ভেবে পায়না, কে তার শিয়রে এসে দাঁড়াতে পারে।

বনহুর উঠে বসবে কিনা ভাবছে, এমন সময় ছায়ামূর্তি ফিস ফিস করে চাপা কণ্ঠে বললো......এসো আর দেরী করোনা...আর দেরী করোনা...এসো আমার সঙ্গে..

বনহুরের মনে হলো কথাগুলো যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে। তবে কি কোন অশরীরী আত্মা, বনহুর ভয় পায়না সে আরও ভাল ভাবে তাকালো, বললো সে—কে? কে তুমি?

একটা হাসির শব্দ। নারী কণ্ঠে কে যেন খিল খিল করে হেসে উঠলো।

বনহুরের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠে।

ধীরে ধীরে উঠে বসে সে।

ছায়ামূর্তি একটু সরে দাঁড়ায়।

বনহুর বলে—হাসলে যে? বলো কে তুমি?

আবার সেই হাসির শব্দ। হাসি থেমে গেলো— ছায়ামূর্তি বললো...আমাকে চিনতে পারছোনা?

বনহুর বললো—না।

এরি মধ্যে আমাকে ভুলে গেছো।

কে তুমি? বলো বলো কে তুমি? আমি আলো জ্বালবো—বলো?

না, তুমি আলো জ্বালতে পারবেনা।

এইতো আমি আলো জ্বালতে উঠলাম।

পারবেনা। পারবেনা তুমি আলো জ্বালতে......আবার সেই হাসির শব্দ।

বনহুর উঠে দাঁড়ায়, ধরতে যায় সে ছায়ামূর্তিকে—কে তুমি বলবেনা? আমি তোমাকে ধরে ফেলবো।

সেই মুহূর্তে ছায়ামূর্তি সরে দাঁড়ায়।

বনহুর পড়তে গিয়ে দরজা ধরে ফেলে।

বাইরে থেকে ভেসে আসে রহমানের কণ্ঠস্বর... সর্দার... সর্দার... সর্দার.. দরজা খুলুন...

বনহুর দরজা খুলে ফেলে।

রহমান মশাল হাতে কক্ষে প্রবেশ করে বলে—সর্দার আপনি কার সঙ্গে কথা বলছিলেন?

বনহুর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো কক্ষটার মধ্যে চারপাশে। কেউ যেন এই মাত্র ছিলো তাকে সে দেখতে পাচ্ছেনা। বনহুর বললো—রহমান, কে আমার ঘরে এসেছিলো। আমি স্পষ্ট তাকে দেখেছি—

সর্দার আপনি কি বলছেন?

হাঁ কেউ এসেছিলো আমার ঘরে।

এটা তো সেই পোড়ো বাড়ি নয়। দরজা ভালভাবে বন্ধ ছিলো—কেউ আপনার ঘরে ঢুকতে পারবে না সর্দার। তাছাড়া এটা মজবুত পাকা বাড়ি।

আমি দেখেছি রহমান কেউ এসেছিলো। ......

সর্দার!

হাঁ রহমান।

সর্দার আপনি স্বপ্ন দেখেছেন।

না আমি জেগে ছিলাম।

কি করে বন্ধ কক্ষে কেউ প্রবেশ করবে?

জানি না কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখেছি। নিজের কানে নিশ্বাসের শব্দ শুনতে পেয়েছি। শুনেছি তার কথাগুলো—শুনেছি তার হাসির শব্দ......

সর্দার মেয়ে না পুরুষ?

নারী কণ্ঠের হাসি আমি শুনেছি। নারী আমাকে ডেকেছে।

সর্দার এ বাড়ি ছেড়ে আমরা চলে যাই।

না না তা হয়না! আমি দেখতে চাই কে সে। কোথায় আমাকে নিয়ে যেতে চায়?

রহমান এবং রামসিং ভীষণ চিন্তিত হয়। এমন কান্ড তো জীবনে ঘটেনি নাই।

তবু তারা ফিরে যায় নিজ নিজ কক্ষে।

রহমান যখন বনহুরের দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকছিলো তখন রামসিংও এসে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে। রামসিং এর মুখেও একটা চিন্তার ছাপ পড়ে।

পরদিন রাতে বনহুর কিছুতেই ঘুমাতে পারেনি। পূর্বদিনের সেই ঘটনা তাকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে। শুয়ে শুয়ে একটির পর একটি সিগারেট পান করে চলছে সে।

কক্ষ মধ্যে একটি মোমবাতি জ্বলছে।

বনহুর নীরবে ধুমপান করছে আর ভাবছে গত রাতের কথা। কে সে? আর কিই বা তার উদ্দেশ্য? আর কেনোই বা সে এসেছিলো তার কাছে। সে যে স্বপ্ন দেখেনি সেটা সম্পূর্ণ সত্য। বনহুর আজ ঘুমাবেনা, সে দেখতে চায় আজও সে আসে কিনা। আর কোন্ পথেই বা আসবে তাও দেখবে বনহুর।

ঘন্টার পর ঘন্টা কেটে চলেছে।

বিশ্ব বিখ্যাত দস্যু আজ মোহ গ্রস্থের মত উদাসীন। একটা অশরীরী ছায়ামূর্তি তাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছে।

লাহোরে কোন এক গীর্জা থেকে রাত চারটা বাজার ঘন্টা ধ্বনি শোনা যায়।

বনহুর চীৎ হয়ে গভীর ভাবে চিন্তা করতে থাকে।

কতক্ষণ যে কেটে গেছে খেয়াল নাই।

বনহুরের একটু তন্দ্রা এসেছে।

হঠাৎ তার শিয়রে কারো উপস্থিতি অনুভব করে সে। সেই নিশ্বাসের শব্দ, সেই কাপড়ের খস খস আওয়াজ, বনহুর রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতিক্ষা করছে , কথা সে বলে কিনা। তাকিয়ে দেখলো একটি নারীমূর্তি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

বনহুর হাত বাড়ালো ওর দিকে, সঙ্গে সঙ্গে বললো কে? কে তুমি? চোখে মুখে তার দারুন উৎকণ্ঠা।